(ছোটদের গল্প)

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দাম : আট আনা

প্রকাশক

শ্রীরাধারমণ দাস

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিচিত্রিত

প্রিণ্টার

শ্রীরাধারমণ দাস

ফাইন আর্ট প্রেস

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ক্ষেপু

খঞ্জু

বড়দাদু

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৪৭

তিন চোর

দেশে আকাল। মানুষ খেতে পায় না। সাধু-পুরুষও চুরি ধরেচে, কাজেই চোরেদের দুর্দ্দশার সীমা নেই! বাঙলা মুল্লুক ছেড়ে এক বাঙালী চোর চল্‌লো পশ্চিমে,—চুরি-ব্যবসা সেখানে যদি ফ্যালাও করতে পারে, এই ভেবে!

কাশীর কাছে এক চটি। সেই চটিতে দুই পাঞ্জাবী-চোরের সঙ্গে তার দেখা হলো।

চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই—এমনি একটা কথা আছে। কাজেই পরস্পরে চেনাচেনি হয়ে গেল। বাঙালী চোরকে তারা জিজ্ঞাসা করলে,—কোথায় চলেছো দাদা?

বাঙালী-চোর বল্‌লে,—চলেছি তোমাদের দেশে,—টাকা-কড়ির বড় সুবিধা হচ্ছে না দেশে······আকাল। ভারী দুর্দ্দিন পড়েছে ভাই।

পাঞ্জাবী চোর বল্‌লে,—পাঞ্জাবেও দুঃখের সীমা নেই! না হলে আমরা দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি···

তিনজনে বসে সুখ-দুঃখের নানা কথা হলো। বাঙালী চোর বল্‌লে,—নিজের-নিজের কাহিনী শোনাই, এসো·

এক-নম্বর পাঞ্জাবী চোর বল্‌লে,—কিন্তু সে-কাহিনী খুব রকমারি আর রংদার হওয়া চাই···

দু-নম্বর পাঞ্জাবী চোর বল্‌লে,—আর সে-কাহিনী শুনে কেউ তা মিথ্যা বলতে পারবে না। মানে, সে-কাহিনী মেনে নিতে হবে······

বাঙালী চোর বল্‌লে,—বেশ, আর শুনে সে-কাহিনীকে যে বলবে আজগুবি কি মিথ্যা, তাকে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে!

তিনজনেই বল্‌লে—বহুৎ আচ্ছা!

তখন এক-নম্বর পাঞ্জাবী চোর নিজের কাহিনী সুরু করলো। সে বল্‌তে লাগলো,—আমার বাপ ছিল লুধিয়ানার এক মস্ত গোয়ালা। গোয়ালে তার গরু আর মোষের অন্ত ছিল না। গুন্তিতে প্রায় সাত লক্ষ। এই সাত-লক্ষ গরুর আর মোষের দুধ যা পাওয়া যেতো, সে দুধ জমা হতো মস্ত এক বাঁধানো তালাওয়ে·· তালাওয়ের এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। দুধ দোওয়া হলে সেই তালাওয়ের মধ্যে গরু আর মোষগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হতো। তাদের মাতামাতির ফলে দুধ মইয়ে ঘোল তৈরী হতো; আর বড় বড় নৌকো ভাসিয়ে তা থেকে ছানা তুলতো যত

জোয়ান পাঞ্জাবীর দল। তারপর সেই দুধ জোগান্ যেতো পাঁচটা লহর বয়ে। এই পাঁচ লহরের নাম হলো তোমার ঐ ঝিলাম, চেনাব, রাভি, বিয়াস আর সট্‌লেজ। এই পাঁচ লহর থেকেই সারা মুলুকের নাম হয়েছে পাঞ্জাব।

শেষে এক সময় কেমন দুর্ব্বৎসর এলো—যত চাকর-বাকর ভয়ানক চোর-বদমায়েস হলো···আর তারা দুধে জল মেশাতে মেশাতে এমন করে তুললে যে এখন দেখবে সেই পাঁচ লহরে খালি জল আর জল! এপার থেকে ওপারে যাও,—দুধে হাত পড়বে না! তাই ভাই, আজ আমাদের এমন দুর্দ্দশা! আর তাই বিদেশে চলেছি মূলধন গুছিয়ে নতুন ব্যবসা ফাঁদ্‌তে···

বাঙালী চোর বেশ বুঝতে পারলো যে গল্পটি নিছক মিথ্যা! কিন্তু মুখে তা বলবার জো নেই! মিথ্যা বললে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। কাজেই সে বললে,—তা ভাই হবেই তো! সাত লক্ষ গরুর আর মোষের দুধ রাখতে গেলে অত-বড় তালাও আর তার সঙ্গে পাঁচটা লহর না কাটালে কুলোতে পারবে কেন? আর ঐ চাকর-বাকরদের শয়তানীর কথা বলছো। হুঁঃ, ওতে পাঁচটা লহর কেন, পাঁচ-দুকুনে দশ লহর বানালেও দেখবে যে জল, সেই জল!.. এ আর কি এমন মজার কাহিনী হলো!

দু-নম্বর পাঞ্জাবী তখন বললে,—আমার কাহিনী বলি, শোনো···এই বলে' সে সুরু করলে তার কাহিনী।

বললে,—আমার বাপের ছিল হাঁসের কারবার। সমস্ত হাঁস খেলে বেড়াবে বলে মস্ত নালা কাটানো হলো, তার নাম দেওয়া হলো সিন্ধু-নদ। ঐ নদে হাঁসগুলি ডানা মেলে ভেসে বেড়াতো! কি চমৎকার যে দেখাতো···যেন লক্ষ-লক্ষ নৌকো সাদা পাল তুলে ভাসছে! হাঁস দেখে চীনের সম্রাট ভারত-আক্রমণ করতে এসে ভয়ে পেছিয়ে গেল। সে ভাবলে, ওগুলো বুঝি জাহাজ ভাসছে! সে হাঁস এত-বড় যে দেখলে পালতোলা জাহাজ বলে সহজেই ভুল হতো! তারপর সেই হাঁসেরা ডিম পাড়তে লাগলো। বাবার হুকুমে ডিমগুলো পাঞ্জাবের এক-কিনারায় জড়ো করা হলো। ওদিককার তিব্বত-চীন দেশগুলো সে-ডিমের পাহাড়ে ঢাকা পড়লো! পড়ে তাদের এমন দশা হলো যে রৌদ্র না পেয়ে শীতে সব কালিয়ে মরে! আর এই ডিমের পাহাড়কে ভুল করে তারা ভাবলে, এমন সাদা পাহাড়···নিশ্চয় বরফের পাহাড়! তাই থেকে সেই ডিম-পাহাড়ের নাম হয়ে গেল হিমালয়! তিব্বতীরা নাকি ড-এর বদলে হ বলে! তারা ডিমালয় না বলে বলতে লাগলো হিমালয়! তাই থেকে ঐ হিমালয়-পর্ব্বত নাম হয়েছে। তারপর একদিন হলো কি, ঐ চীন-সম্রাটের কথা বললুম না? সেই চীন-সম্রাটের ফৌজ যখন হাঁস দেখে ভয়ে পালাচ্ছিল, তখন তারা সেই ডিম-পাহাড়ের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো! যেমন পড়া···ভাবো ভাই, লক্ষ-লক্ষ ফৌজ! তাদের চাপে সব ডিম হুরকুটে ভেঙে গেল! আমরা গরিব হয়ে গেলুম। অত ডিম ভাঙলো···লোকসান কি-রকম

হলো, ভাবো একবার। তাই ভাই, এই স্বদেশী লোকটির সঙ্গে বিদেশের পথে বেরিয়েছি।

বাঙালী চোর বললে,—ভারী আপশোষের কথা! অমন পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল! তা এতেও মজা নেই……অত হাঁসে ডিম পাড়লে ডিমের পাহাড় হবেই তো…তবে সে-ডিম রক্ষা করবার উপায় জানা চাই। জানতে না, কাজেই এখন পস্তাবে তো…

পাঞ্জাবী চোর ছজন ভাবলে, এ তো আচ্ছা লোক! এমন আজগুবি গল্প শুনেও মিথ্যা বলে বুঝলো না…এ তো ভারী বেকুব…

তখন বাঙালী চোর বললে,—এখন আমার কাহিনী শোনো, ভাই…ভারী ছঃখের কাহিনী এ! বেকুবির চূড়ান্ত পরিচয় পাবে'খন… ..

বাঙালী চোরের পানে পাঞ্জাবী চোর ছ'জন হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। বাঙালী চোর তার কাহিনী স্থরু করলে,—

আমার বাবা ছিল গরীবের ছেলে। বাবারা বারো ভাই। অর্থাৎ, আমার খুড়ো ছিল এগারো-জন। বাবা সকলের বড়। মস্ত সংসার। অন্ন-বস্ত্র বাবাকেই জোগাড় করতে হতো। বাবার কষ্টের সীমা ছিল না! এর উপর এক বিপদ ঘটলো,—ছোট কাকা একদিন গাছে উঠেছিল শালিক-পাখীর ডিম চুরি করতে। গাছ থেকে পড়ে ছোটকাকার মাথা ফেটে গেল। রক্তে রক্ত একেবারে! বাবা

ছুটে এসে রাশ-রাশ ধূলো কুড়িয়ে ছোটকাকার মাথায় চাপড়ে দিতে লাগলো! তাতে সে রক্ত থামলো। এখন সেই ধূলোর সঙ্গে ছিল কাপাশের বীজ,—বাবা তা দেখেনি। ছোটকাকার মাথা তো গেল সেরে; কিন্তু চুলের বদলে মাথায় কচি-কচি কাপাশের চারা গজিয়ে উঠলো। বোঝো ব্যাপার, মগজের মধ্যে শেকড় আঁটা! দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এলেন। কবিরাজ এলেন। তারপর পুরুত-ঠাকুর এসে স্বস্ত্যয়ন করে বললেন, তোদের বরাত ফিরেছে রে! এই মাথার খদ্দের বাঙলা দেশে না জুটলেও ম্যাঞ্চেষ্টার-ল্যাঙ্কাশায়ার এসে ওর মাথা ইজারা নেবে! লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে মাথার দাম। হোলো তাই। ছোটকাকার মাথায় সেই কাপাশের চারা বড় হতে লাগলো। আর দু-বছরে সেই সব গাছ বেড়ে তুলোর ফশল যা ফলতে সুরু হলো ভাই, ওঃ, ফরাশডাঙ্গা, সিমলের যত তাঁতি এসে তুলো নিতে লাগলো। শুধু তাই? বেহারে পাঞ্জাবে বোম্বাইয়ে মাদ্রাজে সে তুলো চালান যেতে লাগলো। ল্যাঙ্কাশায়ার-ম্যাঞ্চেষ্টারের বড় বড় কাপড়ের মিল থেকে সাহেব-সুবোর দল ছোটকাকার আশে-পাশে হাত পেতে ঘুরতে লাগলো···কিন্তু সব্বাই তো নগদ দাম দিতে পারে না! ধারে তুলো নিতে লাগলো। শেষে আমরা তুলোর জোগান দিয়ে উঠতে পারি না, এমন হলো! ওদিকে দাম আদায় হয় না। ভারী ফ্যাসাদ বাধলো! তারপর আমরা ক'ভাই বড় হতে আমার উপর ভার পড়েছে, পাঞ্জাবে যত তুলো জোগান দেওয়া হয়েছে, তার দাম আদায় করতে। আমার দুই খুড়তুতো ভাই গেছে বোম্বাইয়ে,

আর কান্দাহারে বকেয়া-দাম আদায় করতে! তা···তোমাদের সঙ্গে পথে দেখা হতে আমার অনেকখানি মেহন্নৎ বেঁচে গেল···

বাঙালী চোর এই অবধি বলে পাঞ্জাবী চোর দুজনের পানে তাকিয়ে রইলো। তারা অবাক হয়ে বললে,—কেন?

বাঙালী চোর বললে,—খাতায় দেখি তোমাদের বাপেরাও ছোটকাকার মাথার তুলো কিনেছিল। তা, তার দাম পাওনা আছে, তোমার বাবার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা আর তোমার বাবার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা···সেই টাকাগুলি এখন দিয়ে দাও তো ভাই!

কথা শুনে পাঞ্জাবী চোর দু-জন ভয়ে শিউরে উঠলো! এ বলে কি? সর্ব্বনাশ!

কিন্তু এ কাহিনী মিথ্যা বললে পাঁচশো করে টাকা জরিমানা দিতে হবে! আবার সত্য বলে মেনে নিলেও সেই পাঁচশো টাকার দায়! জরিমানা দেওয়া কিন্তু লজ্জার কথা! তার চেয়ে···

পাঞ্জাবী চোর দু'জন থলি খুলে পাঁচশো-পাঁচশো গুণে বাঙালী চোরের হাতে টাকা দিলে! দিয়েই তল্পী বেঁধে সরে পড়বার উদ্যোগ করছে দেখে বাঙালী চোর বললে,—কোথা যাও?

পাঞ্জাবী চোর দু'জন জবাব দিলে—দেশে ফিরে যাই। বাঙলা মুল্লুকের মাথার যে-কাহিনী শুনলুম, বাপ্ রে, মাথায় কাপাশের চাষ, তার দরুণ এই দেনা! সে মুল্লুকে গিয়ে পড়লে এমনি পুরোনো দেনা শুধ্‌তে-শুধ্‌তেই ফতুর হয়ে যাবো!

পাঞ্জাবী দু'জন ভয়ে শিউরে উঠলো।

এই কথা বলে তারা চট্‌পট্‌ সরে পড়লো। বাঙালী চোর কর্‌করে এক হাজার টাকা তলপীতে বেঁধে নিয়ে ভাবলে, আমিও দেশে ফিরি! কিন্তু ফেরবার আগে যখন কাশীর কাছে এসেছি, একবার মা-গঙ্গার জলে ছুটো ডুব দিয়ে বাবা-বিশ্বনাথের চরণে প্রণাম জানিয়ে যাই!

জিরেন

ব্যবসাতে শ্রী দিনে-দিনে বাড়ছে প্রাচুর্য্যে!
দিবা-রাত্র খাটছে ভীষণ মাখন চাটুর্য্যে!
লেখাজোখা নাইকো টাকার,—আসছে লাখে-লাখ!
খাবার-নাবার নাইকো সময়! খাটার নাহি ফাঁক!
গিন্নী আছেন ঘরে; ঘরে আছে ছেলে-মেয়ে;
সময় কোথা? চাবেন যে হায়, তাদের পানে চেয়ে!
সবাই বলে,—চিরটা কাল কাজেই মত্ত রবে?
টাকার পাহাড় জমালে তো,—আয়েস করবে কবে?
চাটুর্য্যে কয়,—এই যে দাদা, ছুটো দিন আর খাটি।
তার পরে হ্যাঁ, জিরেন নেবো—জিরেন পরিপাটী!

দিনের পরে দিন চলে যায়, বছর ঘুরে চলে।
কাজের কামাই নাই মাখনের—খাটে বিপুল-বলে।

সেদিন রাতে জলছে বাতি, সবাই নিঝুম ঘুমে ;
খাতা খুলে মাখন একা হিসাব মেলায় ধুমে !
লাখের 'পরে লাখ চড়েছে,—জমার অঙ্ক মোটা—
'নেট্-প্রফিটে' পাহাড় যেন দাঁড়িয়ে গেছে গোটা !
মাখন ত্থাখে।···যতই ত্থাখে, বুকটা ওঠে ফুলে'—
এমন পড়্‌তা, বাজারে নাম,—চল্‌তি খাতা তুলে
জিরেন নেবার সময় কি এই ? জিরেন হাতে মজুৎ !
চলবে নিলে যখন-খুশী ! শরীরও নয় বেজুৎ !
পরম-হৃষ্ট চাটুর্য্যে শোয়। মাথায়, মনের পরে
টাকা-আনা-পাই-পয়সা ছুটোছুটি করে।

সকাল হলো। প্রাণের সাড়া জাগলো ধরার বুকে,—
কাজের চাকা ঘরঘরিয়ে ঘুরলো আবার রুখে !
মাখন তবু ঘুমায়···ঘুমায়...রৌদ্র হলো খর !
বাড়ীর লোকে অবাক্ ! ভাবে, হলো কেমনতর ?
দোর ভেঙ্গে সব ঢুকলো ঘরে। মাখন ঘুমায় ভারী—
চোখ চাহে না ! কয় না কথা ! হলো কি আজ তারি ?
স্বজন-নফর পাড়ার লোকও জম্‌লো ক্রমে-ক্রমে,—
ডাকের পরে ডাক চলেছে—মাখন না তায় দমে !
নড়ে না সে, ত্থায় না সাড়া। মিথ্যে গলাবাজি !
না চাইতে হায়, জিরেন তাকে পেয়েছে যে আজি !

কোষ্ঠীর লিখন

এক ব্রাহ্মণ গণৎকার। তাঁর দুই ছেলে। মারা যাবার সময় গণৎকার বড় ছেলেটিকে দিয়ে গেলেন তাঁর ঘর-বাড়ী, টাকাকড়ি; আর ছোট ছেলেকে দিয়ে গেলেন তার কোষ্ঠী-পত্রিকাখানি।

বড় ছেলের নাম শ্রীধর। ছোটর নাম গঙ্গাধর।

বাপের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকলে গঙ্গাধর কোষ্ঠী-পত্রিকা খুলে বসলো। কোষ্ঠীর লিখন পড়ে দেখলে, তার ভাগ্য একদম ভালো নয়। প্রথমেই লেখা আছে, দারিদ্র্য। তারপর দশ বৎসর হবে কারাগারে বাস।

গঙ্গাধর চমকে উঠলো! কারাবাস? বাপ্‌রে, সে যে দারিদ্র্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর!

কিন্তু ভেবে কি-বা করবে? ভাবলে, কোষ্ঠীর লেখা তো খণ্ডন হবার নয়!

গঙ্গাধর আবার কোষ্ঠী-পত্র পড়তে লাগলো। পড়ে দেখে, তারপরে লেখা, মরণ সমুদ্রতীরে কিঞ্চিৎক্ষণ পরে সুখ-ঐশ্বর্য্য-ভোগ!

গঙ্গাধর ভাবলে, বাঃ, এ তো মন্দ নয়! মরণ যদি হলো, তারপরে আবার সুখ-ঐশ্বর্য্য-ভোগ কি করে হবে?

কিন্তু তার বাবার গণনা কোনো দিন ভুল হয় নি! বাবা যখন গণনা করে নিজের হাতে কোষ্ঠী লিখে গেছেন, তখন তার নড়চড় নেই! নিশ্বাস ফেলে গঙ্গাধর ভাবলে, দেখা যাক, এ লেখা কতখানি ফলে!

সে ঠিক করলে, দারিদ্র্যই যদি ভোগ করতে হয় তো দেশে থাকবে না! আত্মীয়-বন্ধুর চোখের সামনে দারিদ্র্য-ভোগ—সে খুব অসহ্য! তার চেয়ে দুনিয়ার বুকে অজানা দেশে ঘুরে সে দারিদ্র্য ভোগ করবে। তাতে লজ্জা হবে না, কষ্টও কম হবে! আর সমুদ্র-তীরে মৃত্যু? ভাবলে, ভুলেও সে সমুদ্রের দিকে যাবে না! এই দারিদ্র্য আর কারাবাস—এগুলো না খণ্ডাতে পারুক, সমুদ্র-তীরে মৃত্যুর কথা যে লেখা আছে, কোষ্ঠীর সে-লেখা সে নিষ্ফল করবে!

এই কথা ভেবে গঙ্গাধর বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। হাট-বাট-মাঠ পার হয়ে নদী-জলার ধার দিয়ে পাহাড় ঘেঁষে সে চললো কত দূর, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই! শেষে দেখে, সামনে ধূ-ধূ এক মরুভূমি!

তেষ্টায় গঙ্গাধরের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল! অতি-কষ্টে মরুভূমি পার হয়ে সে এলো এক বনের ধারে। সেখানে ছিল মস্ত একটা কুয়ো। চাদরে ঘটি বেঁধে কুয়ো থেকে সে জল নেবে, এমন সময়ে শুনলে, কে যেন কুয়োর মধ্য থেকে বলছে—আমায় তোলো গো, দয়া করে তোলো। আমি ব্যাঘ্ররাজ।

তিনদিন এই কূয়োয় অনাহারে পড়ে আছি ! আমি তোমাকে খাবো না, সত্যি বলছি···বিশ্বাস করো। আমায় তোলো।

গঙ্গাধর ভাবলে, ভয় কি! কোষ্ঠীতে লেখা, আমার মরণ হবে সমুদ্রতীরে! সে-লেখা বদলাবার নয়। বাঘের মুখে যখন মরণ লেখা নেই···

ব্যাঘ্ররাজকে গঙ্গাধর কূয়োর মধ্য থেকে তুললো।

উদ্ধার পেয়ে ব্যাঘ্ররাজ গঙ্গাধরকে প্রণাম করলে। প্রণাম করে বললে,—এ উপকার আমি কখনো ভুলবো না, ঠাকুর। কোনোদিন দরকার হলে আমাকে স্মরণ করো। যেখানে থাকি, তোমার কাছে ঠিক আমি হাজির হবো। এবং আমাকে যা করতে বলবে, করবো।

গঙ্গাধর বললে—কিন্তু বাঘ হয়ে তুমি কূয়োর মধ্যে পড়লে কি করে?

ব্যাঘ্ররাজ বললে—সে কথা বলছি, শোনো। তিনদিন আগে শিকারের সন্ধানে বনে ঘুরছি, এমন সময়ে বনে এলো একজন স্যাকরা। তাকে তাড়া করলুম। সে এসে কূয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলুম—কিন্তু স্যাকরাকে পেলুম না। সে গেল অতল-তলে তলিয়ে, আমি রইলুম কূয়োর মাঝখানে আটকে। শোনো ঠাকুর, বনের পশুকেও বিশ্বাস করো, কিন্তু সাবধান, ঐ স্যাকরাকে কখনো বিশ্বাস করো

না! মানুষ ভারী খল, ভারী হিংসুটে। মানুষ বেইমান হয়। বনের পশু বেইমান হতে জানে না! ও-স্যাকরা যদি মিনতি জানায়, তবু ওকে তুলো না। তুললে সে-উপকারের দাম ও বুঝবে না; উল্টে তোমার অনিষ্ট করবে।

এই কথা বলে ব্যাঘ্ররাজ গেল চলে। গঙ্গাধর কূয়োর ধারে বসে রইলো।

খানিকক্ষণ পরে সে ঘটি নামালো কূয়োয়—কূয়ো থেকে জল তুলতে। শুনতে পেলে, কূয়োর মধ্য থেকে কে বল্‌ছে,—আমি নাগরাজ! আমায় তোলো গো···

গঙ্গাধর নাগ-রাজকেও তুললো।

নাগরাজ বললে—ভয় নেই। আমি তোমাকে কামড়াবো না।···আমি মানুষ নই—উপকারের বদলে কখনো অপকার করি না। আমার আজ যে-উপকার করলে, তা আমি ভুলবো না। যখন তোমার দরকার হবে, আমাকে স্মরণ করো—আমি তোমার দাস্য করবো!

গঙ্গাধর বললে,—কূয়োর মধ্যে পড়লে কি করে?

নাগরাজ বললে,—একটা ইঁদুরকে তাড়া করেছিলুম খিদের দায়ে। ইঁদুর এসে কূয়োয় ঝাঁপ খায়। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে···

নাগরাজ চলে গেল। গঙ্গাধর তখন কূয়োর মধ্যে উঁকি মেরে দেখে, একটা মস্ত ইঁদুর!

ইঁদুর বললে—আমাকে তুলবে না ?

গঙ্গাধর ইঁদুরকেও কূয়ো থেকে তুললো।

ইঁদুর বললে—আমি তোমার দাসানুদাস। এ-উপকার জীবনে ভুলবো না। দরকার হলে আমাকে স্মরণ করো। আর ভালো কথা, ব্যাঘ্ররাজের কথা আমি শুনেছি। সে-কথার দাম আছে। এই কূয়োয় আছে স্যাকরা-মানুষ। তাকে যেন তুলো না। খবর্দ্দার! তুললে সে তোমার অনিষ্ট করবে।

এই কথা বলে ইঁদুর চলে গেল। গঙ্গাধর ভাবলে, তাইতো, পশুগুলোকে উদ্ধার করলুম, আর জেনে-শুনে মানুষটাকে উদ্ধার করবো না ? তার প্রাণে মমতা জাগলো।

কূয়োর মধ্যে উঁকি মেরে সে ডাক্‌লো—ওহে স্বর্ণকার...

ভিতর থেকে স্বর্ণকার বললে—আজ্ঞে মশাই।

গঙ্গাধর বললে—তোমাকে তুলবো ?

স্বর্ণকার বললে—তাহলে পরম উপকৃত হবো।

গঙ্গাধর তখন স্বর্ণকারকেও কূয়ো থেকে তুললো।

স্বর্ণকার বললে—জানোয়ারগুলোর কথা আমি কূয়ো থেকে শুনেছি, ঠাকুর। জানোয়ার আর কবে ন্যায্য কথা বলে, বলুন ? আমার বাড়ী হলো উজ্জয়িনীতে। যদি কখনো ওদিকে যান, আসবেন আমার বাড়ী। আমার নাম হীরেলাল। বুঝলেন ঠাকুর!

এই কথা বলে স্বর্ণকার চলে গেল।

গঙ্গাধর তখন চললো উল্টো পথে। সে তো কোনো গ্রামে থিতু হয়ে বাস করবে না! তার কোষ্ঠীতে যে-সব কথা লেখা আছে, তাতে গ্রামে গিয়ে কোনো লাভ নেই! কাজেই সে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাবে, সঙ্কল্প করেছে!

ঘুরতে ঘুরতে সাত-আট বছর পরে গঙ্গাধর এলো উজ্জয়িনীর কাছে। ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে দেখা হলো। ব্যাঘ্ররাজের কাছে একটি মুকুট ছিল। তাতে হীরে-চুনী-পান্না-মতি বসানো। সে-সব মণির আভায় চোখ ঠিকরে পড়ে!

খুশী হয়ে ব্যাঘ্ররাজ বললে—নাও ঠাকুর এই মণি-মুকুট। আমার যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী!

গঙ্গাধর মণি-মুকুট দেখলো। দেখে ভাবলে, এ যে রাজার মুকুট! এ সব হীরে-মণি বেচলে ঐশ্বর্য্য মিলবে, দারিদ্র্য ঘুচবে!

মণি-মুকুট নিয়ে গঙ্গাধর উজ্জয়িনীতে এলো। মনে পড়লো হীরেলাল স্বর্ণকারের কথা। সে এলো হীরেলালের বাড়ী।

বাড়ী তো নয়—মস্ত প্রাসাদ। মস্ত কারখানা। অনেক কারিগর কাজ করছে।

গঙ্গাধর ডাকলো—ওহে হীরেলাল…

হীরেলাল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে এসে প্রণাম করলে, বললে—এসো ঠাকুর, এসো। বসো।

গঙ্গাধর বসলো। বসে মণি-মুকুট বার করে হীরেলালের হাতে দিয়ে বললে—এটির দাম কত হবে, বলতে পারো?

মুকুট দেখে হীরেলালের চোখ ঝলশে গেল! এ যে উজ্জয়িনীর রাজার মাথার মুকুট! এ-মুকুট গঙ্গাধর কোথা থেকে পেলে?

গঙ্গাধর বললে—বনের সেই ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে দেখা হলো। সে আমাকে মুকুট দেছে। এ-মুকুট বেচে আমি কিছু টাকা-কড়ি চাই। তুমি এ-মুকুট কিনতে পারবে?

হীরেলাল চুপ করে রইলো। এ রাজ্যের রাজা বনে গিয়েছিলেন শিকার করতে—সে আজ ছ'মাস আগেকার কথা। সেই অবধি রাজা আর রাজ্যে ফেরেন নি! তাঁর না ফেরবার কারণ এখন বোঝা গেল। নিশ্চয় ঐ বাঘ তাঁকে খেয়েছে! রাজার লোকজন ফিরে এসে রাজ্যে খপর দেছে—মহারাজকে বাঘে খেয়েছে!

বাঘের উপর হীরেলালের ছিল রাগ! বিশেষ সেই বাঘটা!

সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়লো নতুন রাজার ঘোষণা! নতুন রাজা ঘোষণা করেছেন, মহারাজার মৃত্যুর কারণ যে সঠিক জানাতে পারবে, তাকে দেওয়া হবে অর্দ্ধেক রাজত্ব!

হীরেলাল ভাবলে, খাশা সুযোগ তো! গঙ্গাধরকে যদি এই মুকুট-শুদ্ধু ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার ভাগ্যে অর্দ্ধেক রাজত্ব মিলে যাবে!

রাজত্বের লোভ বড় লোভ! হীরেলাল সে-লোভে মেতে উঠলো!

সে গেল রাজপুরীতে। তার হাতে সেই মণি-মুকুট। রাজাকে বললে,—এই দেখুন মহারাজ, মণি-মুকুট!

তাকে ধমক দিয়ে রাজা বললেন—এ মুকুট তুই কোথা পেলি?

হীরেলাল বললে,—আজ্ঞে, যে-ডাকাত বনে মহারাজের প্রাণ নেছে, আমার কাছে সে এসেছে এ-মুকুট বেচতে!

রাজা বললেন—কোথায় সে-ডাকাত?

হীরেলাল বললে,—আজ্ঞে, আমার বাড়ীতে বসে আছে।

রাজা ডাকলেন সহর-কোতোয়ালকে; ডেকে বললেন,—পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে আনো সেই দুর্বৃত্ত রাজহন্তাকে!

কোতোয়াল তার লোকজন নিয়ে হীরেলালের বাড়ী চললো; এবং গঙ্গাধরকে পিছমোড়া করে বেঁধে সে হাজির করে দিলে রাজার সামনে।

রাজা বললেন—ফাঁশি নয়! ফাঁশি দিলে যাতনা পাবে না। তার চেয়ে ওকে অন্ধ কারাকূপে রেখে দাও দশ বৎসর। খাবার দেবে না, জল দেবে না···কারা-কূপে পচে' শুকিয়ে মরবে!

গঙ্গাধর বললে—কিন্তু শুনুন মহারাজ, কি করে' এ মণি-মুকুট আমি পেয়েছি···

রাজা রাগে আগুন! বললেন—কোনো কথা আমি শুনতে চাই না! মণি-মুকুটে সব প্রমাণ হয়ে গেছে!···রক্ষী, নিয়ে যাও পাষণ্ডকে কারা-কূপে!

গঙ্গাধর গেল কারা-কূপে। ভাবলে, বাঘ বনের পশু! সে ঠিক কথা বলেছিল—বনের পশুকে বিশ্বাস করো, তবু মানুষকে বিশ্বাস করো না!···সে কথা এমন সত্য?

পরক্ষণে মনে হলো, মানুষকে মিছে সে দোষ দিচ্ছে! তার কোষ্ঠীতে লেখা আছে, দশ বৎসর কারাবাস! সে-লেখা বিধাতা-পুরুষের লেখা! মানুষ সে-লেখা খণ্ডন করবে—তা কখনো সম্ভব? কিন্তু তার মরণ হবে সমুদ্র-তীরে; কারা-কূপে মরণ হবে না! তা যদি না হয়, তাহলে এ-দশ বৎসর অন্ধ কারা-কূপে কি করে থাকবে?

কারা-কূপে বসে সে ভাবলো ব্যাঘ্ররাজের কথা···নাগরাজের কথা· কথা!

স্মরণ-মাত্র তারা এসে হাজির সেই কারা-কূপে গঙ্গাধরের সামনে।

বাঘ বললে—বলেছিলুম ঠাকুর, স্যাকরাকে কূয়ো থেকে তুলো না···

সাপ বললে—আমাদের চেয়েও মানুষ ঢের বেশী খল!

ইঁদুর বললে—হাতে-হাতে তার ফল পেলে তো!

বাঘ বললে,—শোনো ইঁদুর, মাটীর নীচে দিয়ে তুমি তৈরী করো মহা-সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ-পথে ঠাকুরের জন্যে তুমি নিয়ে এসো ভালো-ভালো খাবার, ভালো-ভালো বস্ত্র! জলে কাপড় ভিজিয়ে এনো। কাপড় নিংড়ে ঠাকুর সেই জল খাবেন।

ইঁদুর বললে—তোমরা কি করবে?

বাঘ বললে—আমি আর নাগরাজ মিলে রাজ্যের ঘরে-ঘরে উৎপাত সুরু করবো। আমি মানুষ ধরে নিয়ে যাবো—সর্পরাজ ঘরে-ঘরে গিয়ে সকলকে ছোবল দেবে। সর্পরাজের বিষে সকলে আচ্ছন্ন থাকবে! নগরে রটনা হবে, রাজার পাপে প্রজার ঘরে সর্পাঘাত! তারপরে যা হবে, দেখো!

সেই ব্যবস্থা হলো! ইঁদুর সুড়ঙ্গ রচনা করে' সেই সুড়ঙ্গ-পথে খাবার-দাবার আনতে লাগলো। সে খাবার খেয়ে অন্ধকূপে গঙ্গাধরের দেহে দিব্য-কান্তি ফুটে উঠলো। আর ওদিকে প্রজাদের ঘরে-ঘরে সর্পাঘাত! বাঘ এসে গরু-বাছুর ছেলেমেয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। রাজ্যময় হাহাকার পড়ে গেল!

একটি একটি করে' দিন কাটে—দেশের পর দেশ জনহীন হয়! বৈদ্যেরা বলতে লাগলো—সর্পাঘাতের রোগী! ওদের পুড়িয়ো না। দেহগুলো কোথাও ভাগাড় করে রাখো!

নানা দেশ থেকে দলে দলে রোজা আসতে লাগলো।

কারো মন্ত্রে সর্পাঘাতের রোগীদের মধ্যে কেউ প্রাণ পেলে না!

দু' বছর কেটে গেল। দু' বছরে রাজ্যে জীবন্ত প্রজা আর একটিও রইলো না। সাপের বিষে ঘরে-ঘরে পড়ে আছে শুধু তাদের নির্জীব দেহগুলো!

সেদিন রাত্রে কারাকূপে বসে গঙ্গাধর শুনলো, কারা-রক্ষী চীৎকার করে' কাঁদছে। গঙ্গাধর বললে,—কাঁদছো কেন?

রক্ষী বললে,—সাপের বিষে আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ আর বেঁচে নেই! - রাজ্যও প্রজাশূন্য!

গঙ্গাধর চমকে উঠলো, বললে,—বলো কি!

সর্পরাজের কাছে গঙ্গাধর রাজ্যের বৃত্তান্ত শুন্‌লো। রাজপুরী ছাড়া রাজ্যে কারো বাড়ীতে মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো কেউ বেঁচে নেই—সাপের বিষে সব জর্জ্জরিত, অচেতন-অজ্ঞান! আজ রাজকন্যার পালা!

তাই হলো। শেষ-রাত্রে রাজকন্যাকে সাপে কামড়ালো—রাজকন্যা তখন বিছানায় ঘুমোচ্ছেন, এমন সময়!

সকালে রাজকন্যার ঘুম ভাঙলো না। রাজকন্যা চোখ মেলে চাইলেন না।

রাজপুরীতে হুলস্থুল কাণ্ড !

সর্পরাজ এলো গঙ্গাধরের কাছে। এসে বললে,—রক্ষীকে তুমি বলো, সাপে কামড়ানোর ওষুধ তুমি জানো! তারপর যা হবে...আমি আছি।

রক্ষীকে ডেকে গঙ্গাধর বললে,—সাপের বিষে রাজ্যের এ-দশা —আমাকে বলোনি কেন বাপু? আমি এমন মন্ত্র জানি যে সে-মন্ত্রে সাপের বিষ নিমেষে ছুটে যায়।

ছুটী নিয়ে রক্ষী ছুটে গিয়ে নতুন রাজাকে খপর দিলে। নতুন রাজা তখনি গঙ্গাধরকে রাজপুরীতে নিয়ে এলেন। বললেন—পারো ঠাকুর রাজকন্যাকে বাঁচাতে ?

গঙ্গাধর বললেন,—পারি। শুধু রাজকন্যা কেন ? শুনলুম, রাজ্যশুদ্ধ প্রজা সাপের বিষে অজ্ঞান। সকলকে বাঁচাতে পারি।

মহারাজ বললেন—যদি রাজকন্যাকে বাঁচাতে পারো ঠাকুর, তাহলে তোমার সঙ্গে আমি তাঁর বিয়ে দেবো। আর প্রজাদের বাঁচালে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবো।

গঙ্গাধর বললে,—গাড়ী করে প্রজাদের দেহগুলো এনে ঐ কেল্লার সামনে মাঠে জড়ো করুন। আর এক-ঘড়া গঙ্গাজল আনিয়ে দিন।

গঙ্গাজল আনা হলো। গাড়ী-বোঝাই প্রজাদের দেহ এলো। সর্পরাজকে স্মরণ করে গঙ্গাধর সবার গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে

সর্পরাজ বললে,—তারপর যা হবে, আমি আছি।

দিলে। সকলে বেঁচে উঠলো···রাজকন্যাকে বাঁচানো হয়েছিল সবার আগে।

প্রজারা বললে—আমাদের গরু-বাছুর গেছে বাঘের কবলে, মহারাজ!

গঙ্গাধর বললে—সে-সব তোমরা ফিরে পাবে।

গঙ্গাধর স্মরণ করলে ব্যাঘ্ররাজকে। ব্যাঘ্র-রাজের হুকুমে বনের যত বাঘ মিলে প্রজাদের গরু-বাছুর এনে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

রাজা বললেন,—এসো ঠাকুর, টোপর মাথায় দাও। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দি।

গঙ্গাধর বললে—এখন নয়, মহারাজ। আগে একবার তীর্থ দর্শন করে আসি। তীর্থস্নানে কারাবাসের গ্লানি দূর হবে।

রাজা বললেন,—বেশ। কিন্তু বেশী দেরী করো না, বাপু···

গঙ্গাধর বললে—না মহারাজ। আষাঢ় মাসে রথের পরে ফিরে এসে রাজকন্যাকে বিয়ে করবো।

গঙ্গাধর তীর্থে চললো। নানা তীর্থ ঘুরে সে এলো পুরীধামে।

মন্দিরে খপর পেলে, দাদা শ্রীধর পুরীধামে বাস করছে।

এ-কথা শুনে দাদার সঙ্গে দেখা করতে চললো।

কত বৎসর পরে দাদার সঙ্গে দেখা। আনন্দে গঙ্গাধরের দেহ ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো! বালির উপরে গঙ্গাধর ধুম্ করে পড়ে গেল···দু'চোখের সামনে দুনিয়ার আলো গেল নিবে!

যখন চোখ চাইলো, দেখে, সামনে বসে দাদা। দাদার একটু দূরে ব্যাঘ্ররাজ, সর্পরাজ আর ইঁদুররাজ!

গঙ্গাধর বললে—ব্যাপার কি?

ব্যাঘ্ররাজ বললে—রথ দেখতে এসেছিলুম ঠাকুর···

সর্পরাজ বললে—রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে কি না, তাই······

ইঁদুররাজ বললে—রথ তো হয়ে গেছে। এবারে রাজ্যে ফেরো ঠাকুর।

গঙ্গাধর শ্রীধরের পানে চাইলো, বললে—আমি বেঁচে আছি তো দাদা?

দাদা শ্রীধর বললে—এ-কথা জিজ্ঞাসা করবার মানে?

গঙ্গাধর বললে,—আমার কোষ্ঠীতে বাবা যা-যা লিখে গেছেন, সব ফলেছে। তিনি লিখে গেছেন সমুদ্র-তীরে মরণ···

শ্রীধর বললে—তা তো নয়। কোষ্ঠীতে লেখা আছে, সমুদ্র-তীরে মরণ কিঞ্চিৎক্ষণ! অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য মরণ। তারপর এই ত্যাখো লেখা, সুখ-ঐশ্বর্য্য-ভোগ!

গঙ্গাধর ভালো করে পড়ে দেখলো। তাইতো···"মরণ" আর "কিঞ্চিৎক্ষণ"—এ দুটো কথার মধ্যে কমা নেই, সেমিকোলোন নেই, পূর্ণচ্ছেদ নেই! কোষ্ঠীতে কমা-সেমিকোলোন থাকে না! দারিদ্র্য আর কারাবাস লেখা দেখে তার মন খারাপ হয়েছিল!

তাই ঐ কিঞ্চিৎক্ষণ-কথাটা মরণের দিকে না ধরে' সে ধরেছিল সুখ-ঐশ্বর্য্য-ভোগের সঙ্গে !

দাদা শ্রীধর বললে—তা কখনো হয় ! মরণের পরে তো সব শেষ হয়ে গেল ! তখন আবার সুখ ঐশ্বর্য্য-ভোগ কি করে হবে ?

গঙ্গাধর বুঝলো। তাও তো বটে !

দাদাকে প্রণাম করে গঙ্গাধর রাজ্যে ফিরে এলো।

রাজ্যে আনন্দের সাড়া জাগলো।

তারপরে তোমরা যা ভাবছো, তাই ! অর্থাৎ রাজকন্যার সঙ্গে গঙ্গাধরের বিয়ে হলো। ব্যাঘ্ররাজ, সর্পরাজ আর ইঁদুররাজ সকলে কত-কি সামগ্রী উপহার দিলে !

কোষ্ঠীর লেখা অক্ষরে-অক্ষরে মিললো, শেষে সুখঐশ্বর্য্য-ভোগ !

ভালো কথা,—বিয়ের পর স্বর্ণকার এসে গঙ্গাধরের পায়ে পড়লো, বললে—আমাকে ক্ষমা করো ঠাকুর !

রাজা বললেন—চোপ্ রাও পাজী !

গঙ্গাধর বললে—আহা, সবার আজ এত সুখ ! ওকে ক্ষমা করুন মহারাজ।

রাজা বললেন—বেঁচে গেলি স্বর্ণকার ! যা···কিন্তু সাবধান !

দু'হাতে নিজের দুই কাণ মলে' স্বর্ণকার বললে—নিশ্চয়, মহারাজ !

লক্ষ্মী

দুই সদাগর—পাশাপাশি বাস। একজনের একটি ছেলে,—নাম বিনীত। আর-একজনের মেয়ে,—মেয়ের নাম দর্পিতা।

ছেলে-মেয়ে দুটিতে খুব ভাব—দুজনে একসঙ্গে খেলা করে, গল্প করে।

আলাদা বিয়ে হলো। দুজনে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পণ করলে,—আমাদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বিয়ে দেবো!

দর্পিতার বিয়ে হলো খুব বড়লোক সদাগরের ছেলের সঙ্গে। তারা থাকে সাত-মহল বাড়ীতে,—বাগান আছে, পুকুর আছে, দাস-দাসী অঢেল; সাতখানা ডিঙ্গি বোঝাই হয়ে দেশবিদেশে বেসাতি যায়—সে সাত-ডিঙ্গি ফিরে আসে টাকা-কড়ি বোঝাই নিয়ে।

বিনীতর সাত ডিঙ্গি গেল ঝড়ের দোলায় জলের বুকে তলিয়ে,—তার বিষয়-সম্পত্তি সব গেল,—বাড়ী-ঘর বিকিয়ে গেল দেনার দায়ে। বিনীত আজ গরীব। কুঁড়ে-ঘরে তার আশ্রয়।

দিন যায়।

দর্পিতার তিন মেয়ে হয়েছে। বিনীতর তিন ছেলে। তাদের বিয়ের বয়স হলো। পণের কথা দুজনের মনে আছে। বিনীত

বলে পাঠালো দর্পিতাকে—আমাদের যে পণ ছিল,—ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে, তার কি?

দর্পিতা জবাব দিলে,—তোমার ঘরে আমার মেয়ে গিয়ে খাবে কি? তুমি গরীব মানুষ,—তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হতে পারে না!

বিনীতর মনে ব্যথা বাজলো। কিন্তু উপায় কি?

দর্পিতার দুই মেয়ের বিয়ে হলো—বেশ বড় ঘরে। তাদের সোনার আঁচিল; সোনার পাঁচিল!

বিনীতর দুই ছেলে বিয়ে করে বৌ আনলে গরীবের ঘর থেকে। বাকী এখন বিনীতর ছোট ছেলের আর দর্পিতার ছোট মেয়ের বিয়ে!

দর্পিতার ছোট মেয়ের নাম শীলা। মেয়েটি বড় ভালো। মার মুখে সে কতবার শুনেছে ছেলেবেলায় দুজনে পণ করেছিল মন্দিরে দাঁড়িয়ে, ছেলেমেয়ে হলে তাদের বিয়ে দেবে! বিনীত সে-পণ মনে করিয়ে খপর পাঠিয়েছিল—মা তার যে-জবাব দেছে, সে জবাবও শীলা শুনেছে।

শুনে অবধি তার মনে অস্বস্তি! বেচারা বিনীতর মলিন মুখ স্মরণ করে' তার বুক থেকে-থেকে দুলে ওঠে! মনে হয়, অন্যায়! মার এ খুব অন্যায় এভাবে সত্যভঙ্গ করা।

শীলার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ঘটক এলো। বিজয়গড়ের

রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে। শুনে শীলা বললে,—না মা, রাজপুত্রকে আমি বিয়ে করবো না। আমি বিয়ে করবো তোমার ছেলেবেলার বন্ধু বিনীত-সদাগরের ছেলেকে। পণ তুমি রক্ষা করো মা, না হলে পাপ হবে।

মা অবাক! মেয়েকে অনেক বুঝোলেন, বললেন, বিনীত গরীব—বিনীত থাকে কুঁড়ে-ঘরে—তার কিছু নেই!

শীলা বললে,—তা হোক! তুমি যে ছেলেবেলায় পণ করেছিলে!

মেয়ের ধনুর্ভঙ্গ-পণ! উপায় নেই!

শীলার সঙ্গে দিতে হলো বিনীতর ছোট ছেলে প্রশান্তর বিয়ে।

গরীবের ঘর। না আছে সে ঘরে খাট-পালঙ, না দাস-দাসী। নিজের হাতে সব কাজ করতে হয়। শীলা ঘরকর্ণার কাজ করে। সেজন্য তার মনে দুঃখ নেই!

এখন সেদিনের কথা বলি!

দেশের রাজা। তিনি স্নান করেন রাজবাড়ীর খোলা উঠোনে। সোনার ঘড়ায় স্নানের জল,—সে-জলে চাঁপা-বকুলের গন্ধ। সেই গন্ধ-জলে রাজভৃত্যেরা রাজাকে স্নান করায়। রাজার আঙুলে লক্ষ টাকা দামের মাণিকের আংটি। স্নানের সময় সে-আংটি খুলে রাজা রাখেন শ্বেত-পাথরের চৌকিতে।

সেদিনও তাই রেখেছিলেন। কিন্তু কোথায় ছিল একটা

চিল্—ঝুপ্ করে এসে সে-আংটি ঠোঁটে নিয়ে সে গেল উড়ে! ধর্—ধর্—ধর্···লোক ছুটলো চারদিকে···তীর-ধনুক-গুল্তি হাতে নিয়ে···কিন্তু চিলকে ধরা গেল না!

উড়তে-উড়তে চিল চললো বিনীত-সদাগরের কুঁড়ে-ঘরের উপর দিয়ে। সে কুঁড়ের উঠোনে বসে শীলা বড়ি দিচ্ছিল। চিলের ঠোঁট থেকে মাণিকের আংটিটি খশে শীলার কোলে পড়লো।

শীলা চম্‌কে উঠলো! বড়লোক-সদাগরের মেয়ে! মণি-মাণিক সে চেনে।

চিনলে, এ মাণিক—এর দাম লক্ষ টাকা! এ আংটি রাজার ছাড়া আর কারো হতে পারে না!

প্রশান্তকে ডেকে সে বললে,—ওগো, এখনি তুমি আমাকে নিয়ে রাজবাড়ীতে চলো। আমি গিয়ে এ-আংটি রাজার হাতে তুলে দেবো!

শীলাকে নিয়ে প্রশান্ত এলো রাজার কাছে।

রাজার হাতে আংটি দিয়ে শীলা বললে,—এই নিন্ আপনার আংটি, মহারাজ!

রাজা খুব খুশী! বললেন,—কি পুরস্কার তুমি চাও মা, বলো।

শীলা বললে,—পুরস্কার যদি ছান্ মহারাজ তো একটি নিবেদন আছে।

রাজা বললেন,—বলো মা তোমার নিবেদন।

শীলা বললে,—নগরে আদেশ দিন, সামনের বেস্পতিবারে

সন্ধ্যার পর থেকে সারা-রাত বাড়ীতে কেউ প্রদীপ জ্বালবে না—শুধু আমার ঘরে প্রদীপ জ্বলবে। এ প্রার্থনা রক্ষা করলে আমি খুশী হবো।

রাজা বললেন,—তথাস্তু!

বাড়ী ফিরে বিনীতকে শীলা বললে,—এক-হাজার প্রদীপ আর তেল কিনে আনুন বাজার থেকে। বেস্পতিবার লক্ষ্মীবার। ঐ দিন সন্ধ্যা থেকে সারা-রাত বাড়ীতে হাজার দীপ জ্বলবে। যান্…

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নগরে কোনো ঘরে প্রদীপ জ্বললো না। রাজপুরীও অন্ধকার। প্রদীপ জ্বললো শুধু বিনীতর কুঁড়েয়—এক-হাজার প্রদীপ!

মায়ের দেওয়া গরদের শাড়ী পরলো শীলা। সারাদিন নিরম্বু উপবাস করে দ্বারে দিলে আলপনা; দিয়ে বিনীতকে বললে,—আপনি সদরে থাকুন। সাজগোজ-করা কোনো মেয়ে যদি দোরে আসেন, এসে বাড়ী ঢুকতে চান, তাঁকে বলবেন—বাড়ী ঢুকতে দেবো একটি সর্ত্তে। সে-সর্ত্ত, বাড়ী থেকে বাইরে যেতে পাবেন না। বুঝলেন?

বিনীত বললে,—বুঝেছি মা।

প্রদীপ জ্বেলে শীলা বসলো ঘরে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। দ্বারে এসে দাঁড়ালেন মাথায় মুকুট-পরা সালঙ্কারা সুন্দরী।
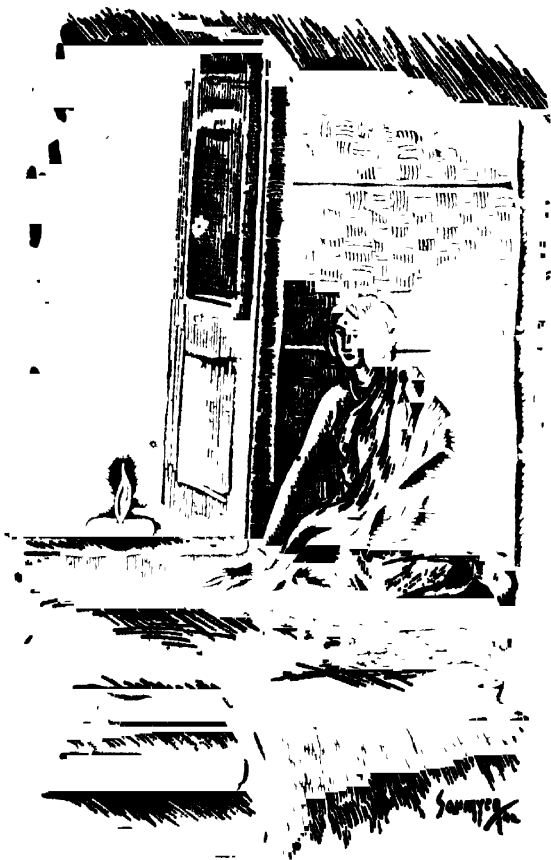
প্রদীপ জ্বেলে লীলা বসলো ঘরে।

সুন্দরী বললেন—দোর ছাড়ো। আমি ভিতরে যাবো।

বিনীত বললেন—একটি সর্ত্ত আছে······

সুন্দরী বললেন—বলো তোমার সর্ত্ত···

বিনীত বললে—বাড়ীতে ঢুকলে এ বাড়ী থেকে আর বেরুতে পাবেন না!

সুন্দরী বললেন—সে-সর্ত্ত রক্ষা করবো।

সুন্দরী কুঁড়েয় প্রবেশ করলেন। তাঁর পায়ে-পায়ে পদ্মফুল ফুটতে লাগলো! দেখে সকলে অবাক!

শীলা তাঁর পায়ে দিলে পুষ্প-অর্ঘ্য; দিয়ে আলপনা-দেওয়া জলচৌকি এগিয়ে বললে—বসো মা······

সুন্দরী বসলেন। শীলা বললে,—জানি মা, আলো-করা ঘর তুমি ভালোবাসো। তাই আমি হাজার দীপের আলো জ্বেলেছি এ-ঘরে! এ-ঘরে তোমাকে পেতে চাই। এ-ঘরে তোমাকে রাখতে চাই!

সুন্দরী বললেন,—বড় লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। তাই মা-লক্ষ্মী আমি তোমার ঘরে এসে আজ আনন্দ পেয়েছি! তুমি বুদ্ধিমতী—তোমার বুদ্ধিতে আমি ধরা দিলুম, মা।

প্রভাত হলো। মা-লক্ষ্মী বিনীতর কুঁড়েয় রইলেন। ধনে-ধান্যে ভাঁড়ার উথলে উঠলো। দুধের পাত্র দুধে ভরে উঠলো—বিনীতর ঘরে জাগলো উল্লাস।

এ-খপর শুনে দর্পিতা মহা-খুশী, বিনীতর কাছে এলো, এসে বললে,—আমার দোষ ক্ষমা করো দাদা!

কপালের লেখা

এক রাজা। প্রজাদের ভালোবাসেন ছেলের মতো। রাজ্যে কার কি কষ্ট, নিজের চোখে দেখে বেড়ান; দূতের মুখে খপরটুকু নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন না! ছদ্মবেশে পায়ে হেঁটে পথে-ঘাটে ঘুরে সকলের খোঁজ-খপর নেন। কাজেই প্রজার ঘরে দুঃখ-কষ্ট বড় একটা নেই!

এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজ্যের সীমানায় এক নদীর তীরে এসে রাজা দেখেন মস্ত বাড়ী। বাড়ীতে চাকর-বাকর, লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া গম্-গম্ করছে একেবারে। বাড়ীর মালিকের অগাধ টাকা। কোনো দুঃখ নেই। মনের সুখে আরামে দিন কাটাচ্ছে। আর এই বাড়ীর ঠিক পাশেই এক গরিবের কুঁড়ে। দেওয়ালের মাটী খসে ঝরে পড়ছে; গোল-পাতার চালে হাজার ফুটো—সেই ফুটো দিয়ে গ্রীষ্মের মাটী-ফাটা তপ্ত রোদ যেমন ঢুকছে, বর্ষার বৃষ্টি তেমনি তোড়ে ঝরে' পড়ছে—শীতের হিমও তেমনি সেই ফুটোয় আনাগোনা করছে! পাশাপাশি এতখানি অবস্থার তফাৎ দেখে রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

পরিচয় নিয়ে জানলেন, এরা দু'ভাই। বড়টি বড়লোক; ছোটটি গরিব। বড়র ধনদৌলত যেমন উপচে পড়ছে, ছোটর তেমনি অভাব। বড় নিত্য দু'বেলা রাজভোগ খাচ্ছে; ছোটর পেট ভরে' দু'বেলা আহার জোটে না!

রাজার ভারী রাগ হলো! তিনি গিয়ে বড়কে বললেন,—কেমন-ধারা লোক তুমি! মার পেটের ভাই, তার পানে চেয়ে ছ্যাখো না! তুমি এমন আরামে সুখে বাস করছো, আর ও-বেচারীর দিন চলে না! ছি!

রাজার ছদ্মবেশ দেখে বড় তাঁকে চিনতে পারেনি। বড় বললে,—ওকে ঢের সাহায্য করেছি,...টাকা দিয়েছি...আহার দিয়েছি...তবু ওর অভাব ঘোচে না। ভগবান ওর বরাতে শূন্য লিখেচেন, তা মানুষ কি করবে?

রাজা বললেন,—এ'ও আবার কথা! মানুষকে মানুষই দেয়। ভগবান হাত-পা গড়ে ছেড়ে দেছেন। সে-হাতে মানুষ রোজগার করবে, গরিবকে দান করবে, তাহলেই কারো দুঃখ থাকবে না! এর মধ্যে ভগবানকে এনে নিজের দোষ ঢাকতে চাও, বাপু!

বড় বললে,—আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ডেকে ওকে না হয় জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা বললেন,—বেশ, দু'ভাইয়ে এক-বাড়ীতে থাকতে পারো তো...

বড় বললে,—ও তাতে রাজী নয়! ও বলে, মাথার উপর ঘরের কড়িকাঠ দেখলে ওর আতঙ্ক হয়,—বড় বাড়ীর বড় থাম দেখলে ওর ভয় হয়, পাছে সে-থাম ভেঙ্গে মাথায় পড়ে! ও কুঁড়ে-ঘরে থাকতে ভালোবাসে! আমি কি করবো, বলুন?

রাজা ভাবলেন, এ তো ভারী মজার মানুষ! বড়-বাড়ীতে

থাকতে ভয় হয় অথচ ঐ ভাঙ্গা চাল-ফুটো কুঁড়েয় ওর এত আরাম! দেখতে হলো!

ছোটর কুঁড়েয় রাজা গেলেন। গিয়ে ছোটকে ডেকে বললেন,—তুমি বাপু তোমার দাদার সঙ্গে একসঙ্গে থাকো না কেন? তোমার দাদার অত টাকা-কড়ি, তা থাকতে তুমি এত কষ্ট সইচো কি দুঃখে?

ছোট বললে,—লোকজনের ভিড়ে আমার হাঁফ ধরে!

রাজা বললেন,—বেশ, তার কাছ থেকে টাকাকড়ি তো নিতে পারো!

ছোট বললে—ভিক্ষে করবো কিসের জন্য? নিজের হাত রয়েছে, পা রয়েছে···

রাজা বললেন,—ভিক্ষে আবার কি! নিজের ভাই, মার পেটের ভাই, বড় ভাই···

ছোট বললে—তা হোক্! নিজের রোজগারের কাছে কিছু নয়...

রাজা বললেন,—এ কথা ঠিক! পর-প্রত্যাশী হওয়া ভালো নয়। মনে খুব জোর থাকলে তবেই মানুষ এমন কথা বলতে পারে। কিন্তু তুমি তো নিজেও কিছু রোজগার করতে পারো না...

ছোট বললে—কি করবো? বরাত! ভগবান যদি না দেন, আমি কি করতে পারি?

রাজা ভাবলেন, এ তো ভারী আশ্চয্যি ব্যাপার! ভগবান আবার কি দিতে আসবেন ? মানুষকে তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন, হাত-পা দিয়েছেন, তারি জোরে সে নিজে রোজগার করবে। এর মধ্যে বরাতই বা কে ? আর ভগবানকেই বা আনা কেন ?

ছোট বললে,—যার কপালে ভগবান যা লিখেছেন, তার আর একচুল নড়চড় হবার জো নেই !

রাজা বললেন—আচ্ছা দেখি, মানুষকে মানুষ দিতে পারে কি না !

এই কথা বলে' রাজা এলেন বড়র বাড়ীতে। বড় তখন বৈঠকখানায় বসে মস্ত গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে।

রাজা বললেন,—হ্যাঁ, তোমার ভাইকে দেখে এলুম ! তোমার দোষ নেই। ও যে গরিব হয়ে আছে, এ ওর নিজের দোষে। দেখি, ওর কিছু করা যায় কি না !

রাজা বাড়ী ফিরে এলেন। ফিরে মন্ত্রীকে বললেন—আচ্ছা মন্ত্রী, টাকা-কড়ি মানুষের বরাতে মেলে, না, নিজের শক্তিতে মেলে ?

মন্ত্রী বললেন,—বরাতে, মহারাজ !

রাজা বললেন,—তাও না কি হয় ! বরাত আবার কি ? বাজে কথা ! মানুষের শক্তিই সব।

মন্ত্রী বললেন,—আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, মহারাজ!

বলে' মন্ত্রী গল্প বললেন,—এই রাজ্যে ছিল দুই বন্ধু। দুই বন্ধুই ছিল গরীবের ছেলে। একজনের নাম ধনদাস, আর একজনের নাম ছিল জ্ঞানদাস। লেখাপড়ায় জ্ঞানদাস দিগ্‌গজ পণ্ডিত হলো, ধনদাস ছিল ফাজিল, গোঁয়ার! সবাই বললে, জ্ঞানদাস খুব রোজগেরে হবে, এত বিদ্যে শিখছে; আর ধনদাসকে জ্ঞানদাসের দোরে দরোয়ানী করতে হবে!…বছর দশেক পরে দেখা গেল, জ্ঞানদাস ছোট একটি পাঠশালা খুলে ছেলে পড়াচ্ছে, রোজগার হয় সামান্য।

রাজা বললেন—আর ধনদাস?

মন্ত্রী বললেন,—ধনদাস বড় হয়ে অর্থকষ্ট সইতে না পেরে একদিন ছুত্তোর বলে কোথায় চলে গেল। কোনো উদ্দেশ রইলো না তার। লোকে ভাবলে, না খেতে পেয়ে ধনদাস মারা গেছে নিশ্চয়! শেষে দশ বছর পরে ধনদাস দেশে ফিরলো বড়-বড় নৌকোয় নানা ঐশ্বর্য্য ভরে'। ব্যাপার কি? ধনদাস বললে,—বিদেশে গিয়ে চালানি ব্যবসা সুরু করে দশ বছরে সে ক্রোড়পতি হয়ে উঠেছে! কাজেই দেখছেন মহারাজ, বিদ্যা-বুদ্ধিই সব নয়। ধনদাসের চেয়ে জ্ঞানদাসের বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের বেশী, অথচ টাকা রোজগার করলে ধনদাস!

রাজা বললেন,—ধনদাসের বিদ্যা না থাকতে পারে, বুদ্ধি ছিল। আর জ্ঞানদাসের ঐ বিদ্যাই ছিল, বুদ্ধি শূন্য।

মন্ত্রী বললেন,—কি করে তা বলি, মহারাজ? পাড়ার লোককে জ্ঞানদাস নানা বিপদে বুদ্ধি জোগায়।

রাজা কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

একটি থলিতে চুপি-চুপি পাঁচশো মোহর ভরে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে রাজা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটর কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছোটকে ডেকে বললেন,—এই নাও থলি। এর মধ্যে পাঁচশো মোহর আছে। এই নিয়ে তোমার বরাত ফেরাও! বলে' থলিটি তাকে দিয়ে রাজা চলে এলেন।

ছোট অবাক! কে এক অজানা লোক তার দোরে এসে যেচে তাকে পাঁচশো মোহর দিয়ে গেল! এ সত্য? না, স্বপ্ন?

থলি খুলে ছোট দেখে, সত্য, মোহরই বটে! একটি-একটি গুণে দেখে, পাঁচশো মোহর। সে ভাবলে, এই পাঁচশো মোহর নিয়ে দিন-ক্ষণ দেখে খুব একটা লাভের ব্যবসা করবে,—করে' সেও এই কুঁড়ে-ঘর ঐশ্বর্য্যে ভরিয়ে তুলবে!

কিন্তু এখন এ পাঁচশো মোহর কোথায় রাখা যায়? ঘরে? উঁহু—যদি চুরি যায়?

অনেক ভেবে মোহরের থলি নিয়ে সে চললো নদীর ধার দিয়ে বরাবর উত্তর-মুখে।

অন্ধকারে চারিদিক ভরে আসছে। অন্ধকারে গা ঢেকে

ছোট এসে দেখে, নদীর ধারে মস্ত এক বটগাছ—ইয়া ডালপালা, ঝাঁকড়া-পাতায় আড়াল তুলে রয়েছে।

সেই গাছে উঠে ছোট একটা ডালে গামছা দিয়ে থলিটা বেশ করে, বাঁধলো। বেঁধে ছোট ভাবলে, মোহরগুলো নিরাপদ রইলো!

এই ভেবে আরামের নিশ্বাস ফেলে সে বাড়ী ফিরে এলো। এসে বৌকে মোহরের কোনো কথা বললে না, চুপচাপ রইলো।

তিন দিন পরের কথা। এ তিন দিন পাঁজি খুলে ছোট সারাক্ষণ শুভক্ষণ খুঁজছে ব্যবসার জন্য। পাঁজির পাতায় দেখে, কেবলি লেখা আছে, ঘাতচন্দ্র! নাহয় তেরস্পর্শ! নাহয় মঘা আর অশ্লেষা!

সন্ধ্যার সময় ছোটর এক স্যাঙাৎ এসে হাজির। তার ভিজে কাপড়, হাত-পা-ছড়া। ব্যাপার কি?

স্যাঙাৎ বললে,—আরে ভাই, সন্ধ্যার সময় খুব ঝড় উঠলো না? ঝড় দেখে আমি বটগাছের উপর চড়ে বসেছিলুম!

বটগাছ! ছোট বললে,—কোন্ বটগাছ?

স্যাঙাৎ বললে,—ঐ যে নদীর ধারে মস্ত ঝাঁকড়া গাছটা... যার বড়-বড় জট নেমেছে।

ছোট বললে,—ও, যার ঐ একটা ডাল নুয়ে জলে গিয়ে ঠেকেছে?

স্যাঙাৎ বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ছোট বললে,—তার পর ?

স্যাঙাৎ বললে—ওঃ, কি ঝড় সে ! অমন যে মোটা বটের ডাল, তা ভেঙ্গে একেবারে জলে গিয়ে পড়লুম।

ছোটর দুই চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে উঠলো ! সর্ব্বনাশ ! ঐ ডালেই যে সে তার মোহরগুলি থলিশুদ্ধ বেঁধে রেখে এসেছে ! সে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠলো।

স্যাঙাৎ বললে—ঝপাৎ করে জলে পড়ে ভাসতে-ভাসতে কত দূরে যে গিয়ে পড়লুম···

আর পড়া ! ছোটর কাণে সে-কথা পৌঁছুলো না ! সে তখনি দে ছুট—সেই বটগাছের উদ্দেশে !

এসে দেখে, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। সে-ডালের চিহ্নও নেই, তা তার মোহরের থলি !

দু হাতে কপাল চাপড়ে ছোট সেইখানে মাটীতে মুখ থুবড়ে পড়লো ! মাথার উপর দিয়ে সোঁ-সোঁ করে ঝড়ের বাতাস তখনো বিপুল গর্জ্জনে বয়ে চলেছে...

পরের দিন সকালে নদীতে স্নান করতে গিয়ে বড়র পায়ে কি একটা ঠেকলো ! তুলে বড় দেখে, একটা থলি ! খুলে দেখে, থলি মোহরে ভরা !

ঘাটে উঠে থলি খুলে বড় গুণে দেখে, পাঁচশো মোহর···

সন্ত একেবারে টাঁকশাল থেকে বেরিয়েছে…ঝক্‌ঝক্‌ করছে! মহানন্দে থলি নিয়ে বড় ঘরে এলো।…

সাতদিন পরে রাজা এলেন খপর নিতে। ছোটকে জিজ্ঞাসা করলেন,—মোহরের খপর কি হে?

ছোট হাউ-হাউ করে কেঁদে সব কথা খুলে বললে। রাজা চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর তিনি এলেন বড়র বাড়ীতে।

বড় সেদিন খুব ধুমধামে লোকজনদের ভোজ দিচ্ছে!

রাজা বললেন,— হঠাৎ এ ভোজ?

বড় বললে,—ঘাটে সেদিন নাইতে গিয়ে একটা মোহরের থলি কুড়িয়ে পেয়েছি। থলিতে পাঁচ-শো মোহর!

রাজা চমকে উঠলেন, বললেন,—সে থলি দেখি।

বড় থলি আনলে রাজা দেখেন, থলির কোণে লাল রেশমী সুতোয় তাঁর নামের হরফ বোনা রয়েছে! তাঁর আর সন্দেহ রইলো না যে, এই মোহরের থলিই সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ছোটকে তিনি দিয়ে এসেছিলেন!…রাজা আর কি বলবেন? একটা নিশ্বাস ফেলে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

দু'দিন পরে রাজা আবার এসে দাঁড়ালেন বড়র দোরে। হাতে তাঁর একটি মোহরের থলি!

বড়কে ডেকে রাজা বললেন,—এই থলির মধ্যে মোহর আছে। এ মোহর আমি ছোটকে দিতে চাই। তবে এমনি খোলাখুলি ভাবে না দিয়ে একটু অন্যভাবে দেবো। পরখ করতে চাই, বরাতের কোনো হাত আছে কি না!

বড় বললে,—বলুন, কি করতে চান?

রাজা বললেন,—এমনি ন'টা থলি আরো জোগাড় করে' দাও। একটিতে ভরো খোলামকুচি; একটিতে ভরো ভাঙ্গা পেরেক, ইট-পাটকেল; একটিতে ময়দা; একটিতে চাল; একটিতে আনাজ-তরকারী...এমনি সব নানান্ জিনিষ! তার পর ছোটকে ডেকে এর মধ্যে থেকে একটি থলি বেছে নিতে বলবে। সে যদি মোহরের থলি ন্যায় তো মোহর তার হবে, আর যদি মোহরের থলি ফেলে অন্য থলি ন্যায়, তাহ'লে এ মোহরের থলি তুমি পাবে!

বড় বললে—বেশ, এখনি আমি বন্দোবস্ত করছি।

বড় বড়মানুষ। তার কত লোকজন,—তখনি হুকুম করতে ঐ মাপে আরো নটা থলি এলো। তার কোনোটায় চাল, কোনোটায় বা আনাজ-তরকারী ভরে বড় থলিগুলি ভাঁড়ারে রাখলে; রেখে ছোটকে ডেকে পাঠালে।

ছোট এলো। বড় বললে—এই সব থলির মধ্যে কোনোটায় চাল, কোনোটায় ডাল, কোনোটায় মোহর, কোনোটায় নুড়িপাথর আছে, যেটা তোমার খুশী, একটা থলি তুমি নাও।

একটা থলি তুমি দাও...

ছোট ভাবলে, এবারে খুব হুঁশিয়ার হয়ে থলি নিতে হবে! মোহরগুলো সেবারে লোকসান হয়ে গেছে, এই থেকে যদি উশুল হয়! বাজিয়ে-বাজিয়ে থলি ধরে যেটা বেশী বাজলো, সেইটে নিয়ে সে ঘরে গেল।

সে চলে গেলে রাজাও তার সঙ্গে গেলেন,—গিয়ে দেখেন, ছোট থলি খুলেছে। থলির মধ্যে যত রাজ্যের নুড়ি, পাথর-কুচি আর ইট-পাটকেল! রেগে কেঁদে ছোট একেবারে পাগল হয়ে উঠলো!

রাজা বললেন,—এ থলিটি কেন নিলে বাপু? বাজিয়েই যখন নিলে···

ছোট বললে,—এটা ভারী দেখলুম, তাই নিলুম···

রাজা বললেন,—নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা গেল না দেখছি! ···বলে রাজা এলেন বড়র বাড়ীতে।

বড় বললে,—এইটে আপনার থলি। আমার বরাতে ভগবান টাকা লিখেছেন, টাকাকে আমার কাছে আসতেই হবে!

রাজা বললেন—আচ্ছা, আর-একবার দেখবো!

আবার এক হপ্তা পরে রাজা এসে ছোটর দোরে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই ছোট বলে উঠলো,—আবার কি মনে করে? বেশ আছি, কেন আর টাকার লোভ দেখাও বাপু?

রাজা বললেন,—টাকা-কড়ির লোভ দেখাতে আসিনি বন্ধু!

রাজ-বাড়ীর বাগানে বড়-বড় কুমড়ো হয়েছে। খাশা কুমড়ো। সেই কুমড়ো ওরা বিলুচ্ছে! গিয়ে তার একটা আনো। যদি বুঝে আনতে পারো তো এক কুমড়োয় বরাত ফিরে যাবে!

ছোট বললে,—চলো। চাল-ডাল তো পয়সা না ফেললে মেলে না! তার চেয়ে একটা কুমড়ো নিয়ে আসি। তাতে দু'-চার দিন পেট চলতে পারে!

ছোটকে নিয়ে রাজা বাগানে এলেন। বাগানে সত্যই অঢেল কুমড়ো জড়ো হয়ে আছে। যে-সে এসে একটা-একটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কারো মানা নেই।

ছোটকে এনে রাজা এক-জায়গায় দাঁড় করিয়ে নিজে মালীর ঘরে গেলেন। গিয়ে একটা কুমড়ো কাঁড়িয়ে তার মধ্যে পাঁচশো টাকার একখানি নোট রেখে কুমড়োটাকে জোড়াতালি দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন; বেঁধে ছোটর হাতে দিয়ে বললেন,—আমি নিজে বেছে দিলুম—এই কুমড়ো নাও। এতে তোমার বরাত ফিরতে পারে!

নিজে বেছে নিতে পারলে না বলে' ছোটর মেজাজ একটু বেঁকে ছিল। তার উপর দড়ি-বাঁধা এই ফাটা কুমড়ো! তবু কোনো কথা না বলে রাজার-দেওয়া কুমড়ো মাথায় করে সে কুঁড়েয় ফিরে এলো; এসে বৌকে বললে,—এই নে কুমড়ো। রেখে দে। ক'দিন আর খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না।

কুমড়োটা বৌকে দিয়ে ছোট গেল স্নান করতে। বৌ সেদিন কুমড়ো-বিলির খপর পেয়ে আগে থেকে গিয়ে একটা কুমড়ো

এনে ছিল—বেশ মস্ত ডাগর একটি কুমড়ো। সে ভাবলে, যে-কুমড়ো এনেছি, হেসে-খেলে তাতে এখন চার-পাঁচ দিন কেটে যাবে। ঘরে রেখে এটাকে কেন পচাই? তার চেয়ে এটা বেচে দি, তাতে কিছু পয়সা হাতে আসবে। সে-পয়সায় তেল, নুন কেনা যাবে।

এই ভেবে ছোটর-আনা কুমড়োটা নিয়ে সে বড়র বাড়ীতে ছুটলো। এসে বড়র বৌকে ডেকে বললে,—দিদি, আমাদের ঘরে কুমড়ো বেশী আছে। তা তুমি যদি এটা নিয়ে দাম দাও, তাই এনেছি। আমার কিছু-পয়সার দরকার।

ছোট জা……ওদের পয়সার কষ্ট—আহা! বড়র বৌ কুমড়ো নিয়ে ছোট বৌয়ের হাতে একটি টাকা দিলে। ছোট বৌ খুশী হয়ে তেল-নুন কিনে কুঁড়েয় ফিরলো।

তেল-নুন দেখে ছোট বললে,—এ-সব কেনবার পয়সা পেলি কোথায়?

ছোট বললে,—আমি নিজে একটা কুমড়ো এনেছিলুম। বেশ ডাগর পুরুষ্টু কুমড়ো! তা এটা আর মিছে পচে কেন? তাই সেটা বেচে একটা টাকা এনেছি।

ছোট বললে—বেশ করেছিস্!

সন্ধ্যার দিকে রাজা এসে হাজির। ছোটকে বললেন,—কুমড়ো খেয়েছো?

ছোট বললে,—খেয়েছি!

রাজা বললেন—তাতে কিছু পেলে?

ছোট বললে—কি আবার পাবো? সে কুমড়োটা বেচে নগদ একটি টাকা পেয়েছি।

রাজা চমকে উঠলেন। সর্ব্বনাশ! সে-কুমড়োর মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট গোঁজা ছিল যে! রাজা বললেন,—কোথায় বেচলে? কাকে বেচলে?

ছোট বললে—বড়র বৌয়ের কাছে।

রাজা বললেন,—বেশ করেছো! তার মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট ছিল রে হতভাগা!

পাঁচশো টাকার নোট!...

ছোট ককিয়ে কেঁদে উঠলো!

রাজা বললেন,—না বাপু, তোমাকে পয়সা দিয়ে খুশী করা মানুষের কাজ নয়, সত্য! তোমার বরাতে পয়সা লেখা নেই! বলে' রাজা এলেন বড়র বাড়ীতে। সেখানে আবার ভোজের খুব ধুম।

বড় বললে—এসো বন্ধু, আজ এখানে খেয়ে যাও। বৌ আজ একটা কুমড়ো কিনেছিল। তার মধ্যে থেকে পাঁচশো টাকার নোট বেরিয়েছে। তা নিজেই ভোগ করবো? লোকজনকে খাইয়ে তাই আমোদ করচি।

রাজা বললেন—তোমার কথাই দেখছি ঠিক! মানুষকে টাকা দেন ভগবান—মানুষ দিতে পারে না!

অসম্ভব গল্প

মস্ত রাজ্য। রাজ্যের নাম ঠিক মনে পড়ছে না। সেই রাজ্যের রাজা,—ইতিহাসে কবে এই রাজার কথা পড়েছিলুম, ...রাজার নামটা ভুলে যাচ্ছি......

তবে রাজা রাজা এবং এ-রাজার বয়স বেশী নয়।

রাজার মন্ত্রী আছে, সভাসদ আছে, অমাত্য আছে, পণ্ডিত-পুরোহিত-খাতাঞ্চি সব আছে,—আর আছে প্রকাণ্ড তোষাখানা, অসংখ্য প্রজা।

তিন হাজার বছর পূর্ব্বে সূর্য্যবংশের কোন্ বংশধর না কি এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! রাজ্যের আইন-কানুন, আদব-কায়দা সংস্কৃত শ্লোকে একেবারে গেঁথে দিয়ে গেছেন। আজো সে আইন-কানুন, আদব-কায়দা এ-রাজ্যের রাজারা সমানে পালন করে আসছেন। বেশে-ভূষায়, আহারে-বিহারে সে বিধি-বিধানের একতিল ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কুলগুরুর প্রধান কর্ত্তব্য, সেই সব বিধি-নিয়ম ঠিক-ঠাক মানা হচ্ছে কি না, দেখা।

সেই সনাতন বিধি-নিয়মের বশে রাজা ওঠেন, বসেন, চলেন, ফেরেন, রাজ্য-পরিচালনা করেন।

সকালে পাঁচটা বাজবামাত্র নহবৎখানায় নহবতে সুর জাগে।

বৈতালিকের দল বন্দনা-গান সুরু করে। এই বন্দনা-গানের সুরে রাজার ঘুম ভাঙ্গে। জেগে উঠে রাজা প্রাতঃকৃত্য সেরে নেন। তারপর নাপিত এসে রাজার দাড়ি কামিয়ে দেয়; ভৃত্য রাজাকে গন্ধ-তৈল মাখায়। রাজা যান স্নানের ঘরে। শ্বেত-পাথরের তৈরী মস্ত চৌবাচ্ছায়-ভরা পদ্ম-গন্ধ-বাসিত স্ফটিক-জল। সেই জলে রাজা স্নান করেন,—স্নানের পর অঙ্গে রাজবেশ-ধারণ। সেই বেশে রাজা এসে সভায় বসেন; কুলগুরু মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন।

রাজা সিংহাসনে বসলে গুরু স্বস্তি-বাচন উচ্চারণ করেন। তারপরে রাজ্যের হিসাব-নিকাশের ফিরিস্তি-রিপোর্ট, কোথায় কি বক্তৃতা দিতে হবে, নব-রচিত চিকিৎসালয়ের দ্বারোদঘাটন-পর্ব্ব তার বিবরণ-পাঠ,—বেলা দশটার মধ্যে সে-সব সেরে রাজা আসেন বিরাম-কক্ষে। এক-ঘণ্টা বিশ্রাম।

প্রত্যহ এই এক নিয়ম।

বেলা বারোটায় রাণীমার সঙ্গে দেখা,—সাড়ে বারোটায় অস্ত্রাগার-পরিদর্শন; একটার সময় তোষাখানা-দেখা; দেড়টায় চা-পান [চায়ের প্রচলন এ-রাজ্যে আজ দেড়শো বছর সুরু হয়েছে। সেও এক ইতিহাস! কুলগুরুর একবার দারুণ সর্দ্দি হয়, সে সর্দ্দি সারতে চায় না। বৈদ্য-হকিম হার মানলে একালের [illegible] ডাক্তার আসেন। তিনিও মিকশ্চার-পিলে সর্দ্দি সারাতে পারেন নি! তখন আসেন চীনা-বৈদ্য থিন্‌শন। রোজ দুবেলা চা খাইয়ে থিন্‌শন কুলগুরুর সর্দ্দি সারিয়ে দ্যান।

সেই-ইস্তক এ রাজ্যে চায়ের প্রচলন! কুলগুরু তাই শ্লোক রচনা করে' শাস্ত্রের পাতায় এঁটে দিলেন—

শুভদা কলিযুগে চা সুখদা বুদ্ধিদায়িকা।
ত্রিসন্ধ্যং যো পিবেৎ চাং সো দীর্ঘায়ুর্হি ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥]

চা-পানান্তে প্রধান মন্ত্রী আসেন রাজার কাছে। বেলা আড়াইটেয় রাজকীয়-পাঠাগারে গিয়ে রাজা বসেন। আধঘণ্টা এ-বই ও-বই পড়েন! তিনটেয় সঙ্গীত-চর্চ্চা; সাড়ে তিনটেয় চিত্রাঙ্কন; বেলা চারটেয় দুর্গ-পরিদর্শন। পৌনে পাঁচটায় দুর্গদ্বার থেকে রাজগৃহে ফিরে বৈকালিক জলযোগ সারেন,— জলযোগান্তে রাজ-রথে কিম্বা হস্তীপৃষ্ঠে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে এক-মাইল পরিভ্রমণ। সন্ধ্যায় নাট্যশালায় অভিনয়-দর্শন; রাত্রি নটায় রাত্রিভোজ এবং সাড়ে নটায় শয়ন ও নিদ্রা।

নিত্য এই এক-ধারা! তিন হাজার বছর ধরে' এই একই নিয়মে সাবেক-কালের আদব-কায়দা রক্ষা করে এসেছেন এ রাজ্যের রাজারা। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। কখনো যদি উৎসবাদির জন্য নিয়মের নড়চড় হয়, তা হলে পূর্ব্বে কুলগুরুর অনুমতি প্রয়োজন। এ-রাজ্যের তিন হাজার বছরের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাই কোনো বৈচিত্র্য নেই! রাজ্য সুশৃঙ্খল। কাজেই কোথাও কোনো প্রতিবাদ ওঠে নি!

এমনি বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে চলার ফলে এ-রাজ্যের রাজার সঙ্গে প্রজার পরিচয় কখনো ঘটে না। কাজ ঠিক চলেছে! এ-কাজের অন্তরালে জগতের কোথায় কি ঘটছে

ৰা কি ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে রাজার-প্রজার কোনো খেয়াল নেই !

কিন্তু একদিন একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। সেই কথা বলি।

সেদিন চা-পান শেষ হলে চিরপ্রথামত মন্ত্রী এসে দাঁড়ালেন, বললেন,—মহারাজ......

রাজা বললেন—কি সংবাদ, মন্ত্রী ?

মন্ত্রী বললেন—মানুষ সনাতন আচার ভুলছে, মহারাজ ! শাস্ত্র-শাসন বুঝি রসাতলে যায় !

রাজা বললেন—তার অর্থ ?

মন্ত্রী বললেন—পাশের রাজ্যের রাজা এ-রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করছে, আর তার সে-কাজে সহায় হচ্ছে আমাদেরই কজন দুর্বৃত্ত প্রজা। এরা বিদ্রোহী।

রাজা বললেন,—এদের এ স্পর্দ্ধা কি সাহসে হলো ?

মন্ত্রী বললেন,—এরা পরিবর্ত্তন চায়।

রাজা বললেন—বটে ! তোপের মুখে এদের উড়িয়ে দাও। সেনাপতিকে আদেশ জানাও...

মন্ত্রী বললেন—তাই হবে মহারাজ।

মন্ত্রী সেনাপতিকে রাজার আদেশ জানালেন। সেনাপতির

আদেশে তোপ দাগা হলো। ক'জন বিদ্রোহীর প্রাণহীন দেহ ধূলায় লুটালো।

একমাস পরে মন্ত্রী এসে আবার বললেন—মহারাজ···

রাজা বললেন—আবার কি হলো মন্ত্রী?

মন্ত্রী বললেন—বিদ্রোহীরা গোপনে আরো বেড়ে উঠেছে। তারা চায় রাজ্যের বিধি-নিয়মের আমূল-সংস্কার।

রাজা বললেন—তার অর্থ?

মন্ত্রী বললেন—তারা বলে, যে-রাজা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে থাকে, তাদের কোন পরিচয় জানেন না, সে-রাজা প্রজাপালন করবেন কি করে'?

রাজা বললেন—হুঁ!···তোমার অভিপ্রায়?

মন্ত্রী বললেন—বিদ্রোহীর উচ্ছেদ।

রাজা বললেন—দাগো তোপ—মুহুর্মুহু।

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ···

রাজা বললেন—কি বলতে চাও?

মন্ত্রী বললেন—আমি ভাবছিলুম, মানে, যদি অনুমতি পাই, তাহলে নিবেদন করি···

রাজা বললেন—দিলুম অনুমতি। তুমি নির্ভয়ে নিবেদন করো।

মন্ত্রী বললেন—সেকালে রাজা-বাদশারা ছদ্মবেশে প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাদের মন বুঝতেন।

রাজা বললেন—হ্যাঁ,হ্যাঁ, সম্প্রতি লাইব্রেরীতে আরব্য-উপন্যাস পড়ছিলুম। তাতে লেখা আছে খালিফ্ হারুন-অল-রসিদ···

মন্ত্রী বললেন—শুধু খালিফ হারুন-অল-রসিদ কেন মহারাজ? আমাদের দেশেও মহারাজ রামচন্দ্র, দিলীপ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি···

রাজা বললেন—বেশ! এই নাও মুকুট। আমাকে দীনবেশ দিতে পারো?

মন্ত্রী বললেন—পারি, মহারাজ।

রাজা বললেন—কুলগুরুর অনুমতি?

মন্ত্রী বললেন—আগে রাজ্যরক্ষা হোক মহারাজ, তারপর সে অনুমতি নেওয়া কঠিন হবে না।

রাজা বললেন—বেশ!

মন্ত্রীর হাতে রাজমুকুট দিয়ে রাজা দীনবেশ ধারণ করলেন। রাজার হাতে একটি চাবি দিয়ে মন্ত্রী বললেন—সমস্ত নগর নিদ্রায় অচেতন হলে খিড়কীর দোর খুলে সেই পথে আপনি নিঃশব্দে রাজপুরী থেকে বেরুবেন।

রাজা বললেন—বেশ। এক সপ্তাহ পরে আমি রাজপুরীতে ফিরবো।

মন্ত্রী বললেন—যেমন আপনার অভিরুচি!···কিন্তু গোপনে রক্ষী······

রাজা বললেন—না, না, কোন প্রয়োজন নেই। আমি

সামান্য প্রজা—কেউ আমাকে চিনবে না। এই থলির মধ্যে এক সপ্তাহের খরচের মতো টাকাকড়ি শুধু সঙ্গে নেবো।

নদীর জনহীন তীরে ছোট গৃহ। জীর্ণ গৃহ। প্রত্যূষে পথশ্রান্ত এক বিদেশী এসে সেই গৃহে আশ্রয় নিলে।

নদীর জলে স্নান করে' পথিক চললো সরাইয়ে। সেখানে ভিড়ে মিশে আহারাদি সম্পন্ন করলে।

সরাইয়ে লোকজনের কি অন্তরঙ্গতা, প্রাণ-খোলা আলাপ! কারো কথায় এতটুকু জটিলতা নেই, কায়দা মেনে চলার ইঙ্গিত নেই। যেমন খুশী গল্প, গান, হাসি, তামাসা—এ যেন আর এক পৃথিবী! গম্ভীর মুখে নিস্পন্দ ভাবে কেউ এখানে থাকে না! চমৎকার! এরই নাম বুঝি জীবন!

নিশ্বাস ফেলে পথিক ভাবলে, এদের পায়ে শিকল নেই, কাজেও কোনো বাঁধা নিয়ম নেই।

সরাই ছেড়ে পথিক বার হলো। সরাইওয়ালার চাকর বললে—আবার এসো ভাই!

কি দরদ! রাজা বললেন—আসবো বৈ কি।

রাজা পথে বার হলেন! রাজপুরীর বাহিরে আনন্দ যেন হাওয়ার মত মুক্ত লহরে বয়ে চলেছে! লোকজনের মুখে-চোখে সে-আনন্দ কি দীপ্তিই না ফুটিয়ে তুলেছে! ঐ তাঁর ক'জন অমাত্য পথে চলেছে। তারা বেশ হাসি-মুখে খোশ-গল্পে মশগুল

হয়ে চলেছে তো! কারো মুখে গাম্ভীর্য্য নেই! ত্রস্ত-ভাব নেই! এরাও হাসতে জানে, প্রাণ খুলে গল্প করতে জানে! তাঁর সভায় তবে অমন মুখ গোমড়া করে এরা থাকে কেন?...

আনন্দ যা-কিছু, তা তবে রাজপুরীর বাইরেই?...

মাথার উপর নীল আকাশ, পাখীর গান, ফুলের গন্ধভরা বাতাসের মুক্ত অবাধ প্রবাহ...সবই অপরূপ!

রৌদ্র পড়ে আসছিল। মাঠে-ঘাটে ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি, রাখালের বাঁশী, মাদলের সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে চাষী-মজুরদলের নাচ-গানের মেলা—ও ভিড়ে তিনিও যদি মিশতে পারতেন! ওদের ঐ আনন্দে নিজের আনন্দ মেলাতে পারতেন!

ক্রমে সন্ধ্যা নামলো। মন্দিরে-মন্দিরে কাঁশর-ঘণ্টার রোল......

উদাসীর বেশে রাজা পথে চলেছেন।...নগরের প্রান্তে বনের ধারে প্রজাদের কি-একটা উৎসব চলেছে! রাজাকে দেখে তারা চীৎকার করে উঠলো,—আয় রে! তোকে বিদেশী দেখচি! আজ আমাদের এ উৎসবে তোর মুখ মলিন দেখতে পারবো না! আয়, খাবি আয়...

উদাসীর বেশে রাজা পথে চলেছেন.

গরীব কাঠুরিয়া···কাঠ বেচে ক' পয়সা সে পায়! সেই পয়সায় অতিথিকে ডাকে এমন আদরে, আসর মাতায় এমন অসঙ্কোচ-আনন্দে...

রাজা বললেন—কি দেবে, দাও।

বুড়া-কাঠুরিয়া লাড্‌ডু এনে দিলে; বুড়ী বাতাসা দিলে; বুড়ার ছেলে মুড়ি নিয়ে এলো; পাতায় ভরে মেয়ে নিয়ে এলো ঝর্ণার জল। রাজা তাদের সেবায়-যত্নে শ্রান্তি দূর করলেন।...

রাত্রে পুরীতে ফেরবার কথা। রাজা ফিরলেন।

দ্বার খুলতে মন্ত্রী বললেন,—কে?

রাজা বললেন—আমি বিদেশী পথিক।

মন্ত্রী বললেন—আসুন মহারাজ। বৈতালিকেরা প্রস্তুত আপনার বন্দনা-গানের জন্য···

রাজা বললেন—আমাকে ছুটী দাও মন্ত্রী। আমি আজ বাহিরে থাকতে চাই। এখানকার এই বিধি-নিয়ম, আদব-কায়দার বাঁধাবাঁধির কথা মনে হলে প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে!

মন্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা নেই। মন্ত্রী বললেন,—মহারাজ···

রাজা বললেন—আনন্দ যা-কিছু, তা বাহিরেই। সে-আনন্দ পাবার জন্য আমি সিংহাসন ত্যাগ করতে পারি···

মন্ত্রী আবার বললেন—মহারাজ···

রাজা বললেন—জীবন কদিনের জন্য মন্ত্রী? জীবনে আনন্দ

যদি না মেলে, তবে কিসের জন্য জীবন?...কতকগুলো নিয়মের বাঁধনে বন্দী হয়ে থাকায় কোনো সুখ নেই। বন্ধনে আনন্দ নেই মন্ত্রী, তাই আমি স্থির করেছি...

মন্ত্রী বললেন—কি স্থির করেছেন মহারাজ?

রাজা বললেন—ঐ বিদ্রোহীদের ডাকবো। ওরা মুক্তি চায়। ওরা চায় দেওয়ালের দুর্ভেদ্য অন্তরালে যে-অন্ধকার জমে আছে, সে অন্ধকার দূর করতে! আমিও তাই চাই। দুর্ভেদ্য কারা-প্রাচীর ভেঙ্গে ওদের রাজা আজ মানুষের মতো ওদের সঙ্গে মেলামেশা করবে! তোমরা যদি তাতে রাজী না হও, তাহ'লে সিংহাসনের অন্ধকূপে আর-কোনো হতভাগাকে এনে বসাও—কায়দা-কানুনের বাঁধনে আষ্টে-পৃষ্ঠে তাকে বাঁধো। আনন্দ কি, আমি তা বুঝেছি। আদব-কায়দার বাঁধন আর মানবো না—মানতে পারবো না!

মন্ত্রী বললেন—মানতে হবে না, মহারাজ! এ দুর্ভেদ্যতা ভেঙ্গে রাজপুরীকে আজ নগরের মুক্ত প্রান্তরের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। তাতে কারো দুঃখ থাকবে না!......

রাজা বলিলেন...তাই হোক মন্ত্রী—তুমি সেই ব্যবস্থাই করো!

নেপোর দই

গ্রামের বুকেতে ছোট খালটুকু
বর্ষায় গেছে ভরি—
মেঘনাদ আর বিভীষণ দুই
বন্ধুতে ছিপ ধরি
দু'পারে বসেছে। নজর দোঁহার
ফাৎনার 'পরে জলে,—

ওই বুঝি নড়ে। ওই ডুবে গেল!
এবার পড়েছে কলে!
কষে দুজনায় মারে জোর-টান—
এ কি হলো! দায় এ কি!
দুজনার ছিপে সুতায়-সুতায়
প্যাঁচ্ লেগে গেছে, দেখি!
মেঘনাদ টানে এপার হইতে,
বিভীষণ আর-পারে—
মাঝখানে মাছ নাচিছে দোদুল্
দোলা পেয়ে দুই ধারে!
উপায়? জোরেতে টানা সে যে দায়!
সুতো ছিঁড়ে যায় পাছে!

এ বলে,—আমার। ও বলে,—আমার
বঁড়শী গাঁথিয়া আছে!

গান গেয়ে হোথা ডিঙ্গি বেয়ে আসে
নেপো রায়েদের ছেলে—
ভারী সে চালাক, কিছু নাহি চায়
খেয়ালের খেলা পেলে!
তারে দেখে খুশী বন্ধু-দুজনে—
ডাকে,—ওরে নেপো, আয়!
দু'জনার ছিপে এক-মাছ গাঁথা
এ যে দেখি মহাদায়!
মেঘনাদ বলে,—এ মাছ আমার
হবে তোকে খুলে দিতে!
বিভীষণ কয়,—কর্ প্রত্যয়,
গাঁথা মোর বঁড়শীতে!
দু'জনার পানে নেপো হেসে চায়,
ডিঙ্গি আনে মাঝ-খালে—
মাছটি খুলিয়া ডিঙ্গিতে ফেলিয়া
বয়ে যায় খুশ্-হালে!
দুজনে অবাক্ ফ্যাল্-ফ্যাল্ চায়,—
মাছ নিয়ে গেল অই!
যার ধন তার ধন নয়, এ যে
নেপো মেরে গেল দই!

ক্রাউন-প্রিন্স

রুরিটানিয়া রাজ্যে প্রচণ্ড বিদ্রোহের ফলে রাজ্যপাট উঠিয়া গেছে—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ক্রাউন-প্রিন্স বেচারা গৃহ-হীন, কপর্দ্দক-হীন—তাঁর দিন চলা দায়!

চার-পাঁচ দিন অন্ন জুটে নাই! ভিক্ষাও মেলে না। ভিক্ষা কে দিবে? বিদ্রোহে-বিপ্লবে সকলের গৃহ হা-হা করিতেছে!

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—অফিসের জন্য একজন কেরাণী চাই।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া ক্রাউন-প্রিন্স গিয়া অফিসের দ্বারে দাঁড়াইলেন। কর্ত্তাকে কহিলেন—চাকরী খালি আছে, তাই আসিয়াছি। প্রার্থী।

—কি কাজ জানো?

ক্রাউন-প্রিন্স কহিলেন—কাজের অভিজ্ঞতা নাই। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

—না বাপু,—নূতন লোক লইয়া কাজ চলিবে না!...

রুরিটানিয়া ট্যাক্সি-কোম্পানি একজন নূতন ড্রাইভার চায়। ক্রাউন-প্রিন্স তাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ম্যানেজার কহিল—ট্যাক্সি হাঁকাইতে জানো?

—জানি না। শিখিয়া লইব।

ম্যানেজার কহিল—পথ ছাখো!

ব্রিটানিয়া নর্থ-সাউথ রেল-কোম্পানি একজন টিকিট-চেকার চায়। উমেদার-বেশে ক্রাউন-প্রিন্স তাদের অফিসে দেখা দিলেন।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কহিলেন—আগে কখনো এ-কাজ করিয়াছ?

—না।

—সব ষ্টেশনগুলার নাম জানো? কোথাকার টিকিটের কত দাম, তাহা জানো?

—আজ্ঞে না। শিখিয়া লইব।

—না বাপু! শিখাইয়া-পড়াইয়া লোক রাখিব, সে অবসর আমাদের নাই!

ক্রাউন-প্রিন্স টলিতে-টলিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাজ নাই! কাজ মিলিবে না! উপায়?

নিশ্বাস ফেলিয়া ক্রাউন-প্রিন্স সাগর-তীরে আসিয়া বসিলেন সাগরের বুকে নৌকা, জাহাজ অসংখ্য। ক্রাউন-প্রিন্স ভাবিলেন, আমি নাবিক হইব! পোত-অফিসে গেলেন। চাকরি খালি আছে।

প্রিল্স কহিলেন—আমি একজন উমেদার।

—কখনো নৌকা চালাইয়াছ ?

—সরিয়া পড়ো। ভিড় বাড়াইয়ো না।

প্রিল্স চলিয়া আসিলেন।

অন্ন-হীন, কপর্দ্দক-হীন, উপায়-হীন প্রিন্সের বেদনার সীমা নাই! দেহ আর চলে না! মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে—চোখের সামনে শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী!

এক কুলি-সর্দ্দার লোক খাটাইতেছিল। তার কুলিরা পাথর ভাঙ্গিতেছে! প্রিন্স গিয়া সর্দ্দারকে ডাকিলেন—সর্দ্দার···

—কি চাও ?

—আমি কুলির কাজ করিব। পাথর ভাঙ্গিব। আমাকে কাজ দাও!

সর্দ্দার—কহিল—কি কাজ, জানো ?

—আমি ? প্রিন্স কহিলেন—জীবনে আমি এক হাজার সাতশো বাহান্নটি ফাউণ্ডেশন-ষ্টোন্ (গৃহ-নির্ম্মাণে প্রস্তর-ফলক) পাতিয়াছি।

সর্দ্দার কহিল—সে-কাজ এখানে মিলিবে না!

যম-যম

ল পড়ি। হোষ্টেলে থাকি।

খেয়ালি মন। নাটক-নভেলে রুচি নাই। অবসর মিলিলে রেলওয়ে-টাইম-টেব্‌ল্‌ খুলিয়া বসি। ছুটাছাটার দিনে ট্রেণে চড়িয়া বাহির হই। বাছ-বিচার করিয়া মধুপুর বা সিমলা-দার্জ্জিলিং যাই, তা নয়; কোনো দিন যাই কাঁচড়াপাড়ায়; কোনো দিন বা আঁতুল। অর্থাৎ কম-পয়সায় যতটুকু হয়! সৌখীন জায়গায় যাইতে খরচ বেশী; কাজেই সেদিকে ঘেঁষা যায় না।

যাতায়াত থার্ড-ক্লাসে।

পূজার ছুটী কাটাইয়া হোষ্টেলে ফিরিয়াছি। সামনে কালী-পূজা। ছু'দিন কলেজ বন্ধ। সহরের পথে-ঘাটে পট্‌পট্‌ শব্দে পট্‌কা ফুটিতেছে; উড়ন-তুবড়ির সোঁ-সোঁ উৎপাত সুরু হইয়াছে।···জ্বালাতন!

ছুই দিদির কাছ হইতে ভাইফোঁটার জন্য নগদ কিছু টাকা মিলিয়া গেল। দিদিরা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া লিখিল, ফরাস-ডাঙ্গার ভালো ধুতি কিনিয়া দ্বিতীয়ার দিন পরিস্‌, আর ভালো খাবার···অন্যথা না হয়!

ভাবিলাম, মিলের ধুতিতে ভোকা চলিয়া যায়—কাজ কি

ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিয়া বাবু-সজ্জায়! তার চেয়ে এ-টাকায় ট্রেণে চড়িয়া লম্বা-পাড়ি...

টাইম-টেব্লের পাতা উল্টাইয়া হিসাব কষিতে লাগিলাম; প্রচণ্ড মনোযোগে। সতীর্থেরা টিট্‌কারী দিল, মানুষ বিলাত যাইতে বসিয়া এমন হিসাব কষে না! সে-কথায় কর্ণপাত করিলাম না।

বর্দ্ধমানের ওদিকটা আমার সম্পূর্ণ অজানা—সুমাত্রা, নিউ-ফাউণ্ডলাণ্ডের মতো! অতএব···

স্থির করিলাম, অণ্ডাল যাইব। মস্ত জংশন। শুনিয়াছি, অনেক কয়লার খনি আছে। ঘুরিয়া খনি দেখিব—একটা নূতন অভিজ্ঞতা-লাভ।

রাত্রি-বাস! কেন, হোটেল নাই? না থাক, কোনো বাঙালীর গৃহে গিয়া না হয়..

শুনিয়াছি, বর্দ্ধমানের ওদিকটায় যে-সব বাঙালীর বাস, তাঁরা এদিককার বাঙালীর মতো হাড়-কঞ্জুষ নন্। গৃহে অতিথি আসিলে বিরক্ত হন না; যত্ন করিয়া ঠাঁই দেন। তার উপর আরো শুনিয়াছি, বাঙালী পাইলে বিদেশের বাঙালী তাকে লুফিয়া লয়!

খেয়াল হইল, ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরিয়া বাবু সাজিবার পরিবর্ত্তে ট্রেণের সেকণ্ড-ক্লাস কামরায় চড়িয়া বাবুয়ানা করা যাক! অর্থাৎ সেকণ্ড-ক্লাসের টিকিট দেখিলে ষ্টেশনের বাবুরা খাতির করিবে। জানি তো থার্ড-ক্লাসের যাত্রীদের তারা কি চোখে দেখে। গান্ধী-মহারাজের প্রাণ কাঁদিল হরিজনের জন্য!

হায় রে, থার্ড-ক্লাসের যাত্রীদের জন্য চাঁদা জোগাড় করিলে দেশের একটা মস্ত দুঃখ দূর হইবার আশা থাকিত !

দেশের নামে যে-চাঁদা ওঠে, সে-টাকায় দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার সত্য বাসনা যদি 'ফণ্ডী'দের চিত্তে এতটুকু থাকিত, তাহা হইলে 'ফণ্ডী'র ফন্দী আজ ধরা পড়িত না, আমরাও বর্ত্তাইয়া যাইতাম !

চতুর্দ্দশীর রাত্রে মোকামা-এক্সপ্রেসের সেকণ্ড-ক্লাস কামরায় একটা রিজার্ভ-বার্থে চড়িয়া বসিলাম।

ট্রেণ ছাড়ে-ছাড়ে, এক জোয়ান ভদ্রলোক আসিয়া কামরায় ঢুকিলেন। সাহেবী পোষাক—গায়ের বর্ণ তামাটে—দাড়ি-গোঁফ চাঁছা—চোখে টর্টয়েশ-শেলের মোটা ফ্রেমের চশমা। বড় বড় দুটো গোল কাঁচ। চোখের উপর যেন মোটর-গাড়ীর দুটো হেড লাইট্‌ আঁটা !

ভদ্রলোকের সঙ্গে কুলি। কুলির মাথায় মস্ত সুটকেশ, আর বাহারে সতরঞ্চি-জড়ানো ষ্ট্রাপ-বাঁধা বিছানা। ভদ্রলোকের বর্ণ তামাটে হইলেও চেহারা এবং সাজসজ্জার দিকে তাঁর যত্নের সীমা নাই।

এ-সময়টায় কলিকাতা ছাড়িয়া লোকে বাহিরে পাড়ি দেয় না। এখন সকলের ফিরিবার পালা। বাহিরে হাওয়া খাইতে গিয়া খরচ-পত্র করিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া সকলে পয়সার বাজারে

যুদ্ধং দেহি বলিয়া ঝাঁপ খাইবার রোখ লইয়া কলিকাতায় ফিরিতেছে। আমার কামরায় দুদিককার বার্থে দুটি মাড়োয়ার-বাসী হাঁটুর কাপড় তুলিয়া বসিয়া আছে। ভেইয়া-ভেইয়া বলিয়া ফটকা-বাজারে আগুন লাগাইবার বাসনায় একজন কথার চক্‌মকি ঠুকিতেছে, আর-একজন কোলের উপর একগাদা শসা ও আতা রাখিয়া নির্ব্বিকার নির্লিপ্তভাবে সেগুলার সদ্ব্যবহার করিতেছে। আগন্তুক ভদ্রলোক আসিয়া মাঝখানের বার্থটি দখল করিলেন।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মোট খুলিয়া ভদ্রলোক বিছানা পাতিলেন; পরে কোটের পকেট হইতে পার্শ, চেন-সমেত ঘড়ি এবং চাবির রিং বাহির করিয়া বালিশের নীচে গুঁজিলেন; কোট এবং ওয়েষ্ট-কোট খুলিয়া হ্যাঙ্গারে ঝুলাইলেন। এ-কাজ সারিয়া ৫৫৫ মার্কা সিগারেটের টিন খুলিয়া সিগারেট ধরাইয়া ঠোঁটে চাপিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন।

তাঁর পানে অবিচল নেত্রে আমি চাহিয়া ছিলাম। ভাবিতে ছিলাম·····

কিন্তু সে চিন্তার পরিচয় দিলে আমরা শিক্ষা ও ভদ্রতার সম্বন্ধে তোমাদের মনে হয়তো নানা সংশয়ের সৃষ্টি হইবে। তবু এ-কাহিনী বলিতে বসিয়া সেটুকু গোপন রাখি কি বলিয়া? বাঙালী চিরদিন বেশী বকে। বচনেই বাঙালীর বাঙালীত্ব; অতএব সে-চিন্তার খেইটুকু লুকাইয়া বাঙালীর নামে কলঙ্ক দেওয়া উচিত হইবে না।

অর্থাৎ আমি ভাবিতেছিলাম, ঐ তো গায়ের রঙ! হুঁ! এমন সাহেব নাই সাজিতে, বাপু! লোকটিকে দেখিলে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—তোমরা মুখ টিপিয়া খুব হাসিতে—এ-বয়সেও তাঁর চেহারাও সাজ-সজ্জার সাধনা দেখিয়া!

রাত্রে নিদ্রা-সুখ পুরাপুরি উপভোগ করিবার বাসনায় ভদ্রলোক একটি পায়রার পালক পর্য্যন্ত বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম, রাত্রে কাণ চুলকায়, তাই এ ব্যবস্থা!

এবং ব্যবস্থা দেখিলে মনে হয়, এ-জন্মে বাঙলা দেশে বাঙালীর দেহে প্রাণটা প্রবেশ করিলেও ও-প্রাণে ইস্তাম্বুলী আমেজ এখনও লাগিয়া আছে! নহিলে আরামের এমন সমারোহ এ-বয়সে সাধারণ-বাঙালী হৃষিকেশ কিম্বা ভৃত্যদের হাতে সমর্পণ করিয়া বসে।

কিন্তু ও কথা যাক।

কায়দা-কেতা দুরস্ত করিয়া ভদ্রলোক শয্যায় হেলিয়া পড়িলেন। সাহিত্যে এ-ভাবকে বলে অর্দ্ধশায়িত-ভাব। হঠাৎ কি খেয়াল হইল, ৫৫৫—মার্কা-টিনটা আমার সামনে আগাইয়া ধরিয়া বলিলেন,—সিগারেট ইচ্ছা করেন?

সবিনয়ে কহিলাম,—আজ্ঞে, অভ্যাস নেই।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আশ্চর্য্য! Modern যুগ···young man! এ যুগে বাঙলার কোনো কোনো

বাড়ীর অন্দরেও এ-বস্তুর আদর চলেছে। আর আপনি··· দীক্ষা হয় নি ?

কহিলাম,—না।

কহিলেন,—বেশ! বেশ! এগুলোকে যত এড়িয়ে চলা যায়, ভালো। তা বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয়? ওকালতি?

কহিলাম,—আজ্ঞে না, ল পড়ছি।

হাসিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—ঠিক ধরেছি।

ওকালতি-ওকালতি-ওকালতি কেবলম্।

কলৌ বাঙালীর নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

রসিক লোক! কোনো জবাব দিলাম না। শুধু মৃদু হাসিলাম।

ভদ্রলোক কহিলেন,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

কহিলাম—অণ্ডাল।

—অণ্ডাল! স্বরে ভদ্রলোক এমন প্রতিধ্বনি তুলিলেন, যে আমি ভড়কাইয়া গেলাম! যেন এমন জায়গায় চলিয়াছি from where no traveller...

কহিলেন,—নেমন্তন্ন আছে ?

বলিলাম—না। এমনি···বেড়াতে যাচ্ছি।

—ও! Pleasure-trip! মানে, to know the world...

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। আমি তাঁর পানে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, আচরণে-বাক্যে ভদ্রলোক নিজেকে

খুব একজন ওস্তাদ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভঙ্গী বেশ মুরুব্বির মতো!

বলিলেন—আইনে কি আর হবে? ওদিকটায় ভয়ঙ্কর ভিড় জমে গেছে। তার চেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে গেলে ভালো করতেন। young man...ওদিকে কেন যে আপনাদের দৃষ্টি পড়ে না! জানেন তো, কথা আছে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। এই বাণিজ্যে চাই মূলধন আর বিজ্ঞাপনের আর্টে ওস্তাদী! যদি বলেন, তার অভাব। তা হলে তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি রয়েছে। বাঙলা দেশে মাঠের অভাব নেই! এই রেলওয়ে-লাইনের দুধারে দেখবেন মস্ত-মস্ত মাঠ। চাই শুধু দু'চার-জোড়া বলদ, খান-আষ্টেক লাঙ্গল, আর সেই সঙ্গে এক-কুড়ি জোয়ান চাষা! ব্যস্—আপনাকে তখন মারে কে?......বাঙালীর ছেলের কবে যে এ সুবুদ্ধি হবে!

কৌতুক-বোধ করিতেছিলাম। এ উপদেশ ঘরে-বাহিরে শুনিয়া আসিতেছি জ্ঞান হওয়া ইস্তক। আরো কত-কাল শুনিব? লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া আমরা যাই মাঠে—আর সেই অবসরে তোমরা ছেলে-জামাই ভাইপো-ভাগনেদের ধরিয়া চালান করে বার-লাইব্রেরীর দিকে! বটে!

কহিলাম,—কাগজে এ সম্বন্ধে যদি একটু লেখালেখি করেন.....

ভদ্রলোক কহিলেন,—Journalism? ক্যালকাটা-ইউনিভার-সিটি Journalismএর ব্যবস্থা করছে। ছাই হবে! Journalism

এর মানে তো খেয়োখেয়ি! হুঁঃ, Journalism-এ success করতে হলে ব্যবসা-বুদ্ধি চাই! সে বুদ্ধি দেবে কে?

কথার ভাবে মনে হইতেছিল, ভদ্রলোক মস্ত কোনো কাজ করেন। এবং সে-পরিচয় সগৌরবে পথের লোক ধরিয়া তাদের জানাইতে চান।

কৌতুকের বাসনায় প্রশ্ন করিলাম,—যদি কিছু মনে না করেন, আপনি ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট?

বাঙালীর পক্ষে কৃতিত্বের ও গৌরবের এটাকেই পরম-পদ বলিয়া আমার বিশ্বাস।

হাসিয়া তিনি বলিলেন,—না। মানে, আমি ট্রাভলিং-এজেন্ট। বিখ্যাত ওষুধ আছে 'যম-যম'—পেটেণ্ট ওষুধ। আমি তার সোল এজেন্ট ফর্ ইণ্ডিয়া।

—বিলিতি ওষুধ?

—না। স্বদেশী। 'যম-যম' নাম শোনেন নি?

স্মৃতির ভাণ্ডারকে এ-বয়সে বিরাট শিল্প-মেলায় পরিণত করিয়াছি। জানা-অজানা, চেনা-অচেনা কত কি যে সে-ভাণ্ডারে ঠাশিয়া রাখিয়াছি! সেই ভাণ্ডারের আনাচে-কানাচে সন্ধান করিতে লাগিলাম।

মনে পড়িল। ঠিক! পথে-ঘাটে প্লাকার্ড দেখিয়াছি বটে! তা-ছাড়া মাসিক ও দৈনিক কাগজ-গুলার ঘাড়ে-পিঠে বিজ্ঞাপন।

যম-যম

দুনিয়ার যাবতীয় ব্যাধির যম! এ ঔষধ-সেবনে জ্বর-যক্ষা,

প্লীহা-লিভার, হাঁচি-কাসি, হাম-বসন্ত, কলেরা-টাইফয়েড, দাঁতে পোকা, গাঁটের বাত—কি না সারে! মনে পড়িল, বিজ্ঞাপন দেখিয়া তামাসা করিয়া আমরা বলিতাম,—এ ঔষধ-সেবনে বন্ধ্যার পুত্র হয়, বখা-ছেলে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পাশ করে, বেকারের চাকরি হয়; অদন্তের দন্ত, আইবুড়ার বিবাহ, দাগীচোরের মামলা-জিত এবং অন্ত্যকালে স্বর্গ-লাভ হয়!

কহিলাম,—ওষুধের নাম শুনেছি বটে। অদ্ভুত নাম! মনে পড়েছে। তা, এ ওষুধ এত বেশী বিক্রী হয় যে, আপনার মতো লোককে মোটা-টাকা কমিশন দিয়ে এজেন্ট রাখে?

হাসিয়া জবাব দিলেন,—এটা হলো বিজ্ঞাপনের যুগ।... লেখার আর্ট নিয়ে আজ-কাল খুব হৈ-চৈ পড়েছে না? সে-আর্ট এই ব্যবসার ক্ষেত্রে সোনা ফলাতে পারে। এ-আর্টে আমার বিধি-দত্ত ক্ষমতা আছে! যাকে বলে, প্রতিভা!

ভদ্রলোকের মুখে-চোখে—সাহিত্যে যাকে বলে গৌরবের দীপ্তি—ঠিক সেই দীপ্তি!

কহিলাম,—এ ওষুধের গুণ আপনি নিজে পরখ করেছেন, নিশ্চয়! মানে, খেয়ে ফল পেয়েছেন?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিচিত্র এক ভঙ্গী-সহকারে ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি? কস্মিন-কালে নয়।

—তবে?

ভদ্রলোক কহিলেন,—যম-যমের সঙ্গে আমার সংযোগ—সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী! শুনলে বুঝবেন, ডিগ্রী পান্ আর

যাই করুন, বিজ্ঞাপনের আর্ট জানা না থাকলে সবই ভস্মে ঘী ঢালা! জগতে যেখানে success, সন্ধান নিলে দেখবেন, সেখানে সে success-এর মূলে আছে বিজ্ঞাপনের আর্ট!

কহিলাম,—অবশ্য আপনার স্বাস্থ্য যে-রকম দেখছি, তাতে ওষুধ খাবার প্রয়োজন বোধ হয় জীবনে হয়নি!

ভদ্রলোক হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন,—আমার স্বাস্থ্য? হুঁঃ! দুনিয়ায় এমন ব্যাধি নেই, যা আমার শরীরে প্রবেশ করেনি! মানে, আমি বেঁচে থাকবো, এ-আশা কারো মনে জাগে নি!...

বিস্ময় বোধ করিলাম। এমন জোয়ান শরীর! হায় রে, সে শরীরও ছিঁড়ে খায় ব্যাধির কুক্কুরে!

ভদ্রলোক কহিলেন,—আশ্চর্য্য হচ্ছেন!...এখনো ঘুম পায় নি তো? শুনুন তবে বলি সে-কাহিনী। মাসিক পত্রে কত লোক কত-রকমের গল্প লিখছে—নিশ্চয় পড়েন। আমার এ-গল্প তাঁদের সে-সব বানানো গল্পের চেয়ে কম মজার নয়!

ভাবিলাম, মন্দ কি! মাসিকে অনেক গল্পে পড়ি, লেখকদের সঙ্গে ট্রেণের কামরায় কত লোকের দেখা হয় ক্ষণেকের জন্য—সেই ক্ষণেকের মধ্যেই তারা কত সরস বিচিত্র গল্প শোনায়। আমার ভাগ্যে তেমন গল্প যদি জুটিয়া যায়, তাহা হইলে সে-গল্প ছাপিয়া বাঙলার কথা-সাহিত্যে খানিকটা জায়গা দখল করিতে পারিব তো!

ভদ্রলোক কহিলেন,—শুনলে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন!

কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়, কেউ জানে না। আর-একটা মজা দেখবেন—দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটে, তার কোনোটা ফ্যাল্‌না নয়। আমার এই শরীর যে ব্যাধি-মন্দির ছিল, তার কারণ আর কিছু নয়, ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধিলাভ হবে এই ব্যাধির মারফৎ···তারি জন্য!···কথাটা আগাগোড়া সব শুনুন, তবে আমার এ-আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝবেন!

আজ দেখছেন, আমার শরীর এমন আঁটসাট মজবুত—আমি ইয়া জোয়ান! কিন্তু পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার দেহ ছিল লিক্‌লিকে পাঁকাঠি! পাঁকাঠি বলবার হেতু, রোগের চাপে দেহ ঠিক পাঁকাঠির মত মড়্‌মড়্ করতো—কখন্ চিড় খায়, কখন্ ফাটে! হেন ওষুধ ছিল না—যা পেটে যায় নি! ওষুধে আমার মার প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল। আমি হাঁচলে বা কাসলে মা আমাকে ওষুধ খাওয়াতেন। বাড়ীতে তাঁর নিজের একটি ছোটখাট ডিস্‌পেন্সারী ছিল। হোমিওপ্যাথির বাক্স, বই; কবিরাজী বড়ি-পাঁচন; টোটকার ঝুলি; এ্যালোপ্যাথি-কুইনিন, জেনাসপ্রিন, টিংচার আয়োডিন, স্মেলিংসল্ট, পেপ্‌স, গ্রীমণ্ট সিরাপ, লাইকর-অ্যামোনিয়া; ওদিকে জোয়ানের জল, মৌরির জল, চুণের জল, নালতে, চিরেতা, সোমরাজ, ছোলা-নিমপাতা। এগুলো আমার প্রায় নিত্য-খাদ্যের সামিল হয়েছিল।

আমার এই দেহখানি ছিল যেন চামে-ঢাকা হাড়ের বোঝা! নিত্য অসুখ হতো। মা নিশ্বাস ফেলতেন। মাথায় পয়সা ছুঁইয়ে তুলসী-তলায় নিত্য পুঁতে রাখতেন মানসিক করে'! তুলসী-

তলায় ছোটখাট একটি কারেন্সি-অফিস জমে উঠেছিল। আত্মীয়-স্বজন হা-হুতাশ করতেন—ও-ছেলের চিকিৎসায় মিছে পয়সা খরচ করার মানে শুধু অপব্যয়! ও যক্ষ্মা নিশ্চয়—না হলে দিন-দিন ছেলে অমন পাকিয়ে সিড়িঙ্গে হবে কেন? .

ব্যাধির মধ্যে সেরা ব্যাধি ছিল পেটের অসুখ। অর্থাৎ পাকস্থলী—যার মানে এই stomatch. ডাক্তাররা বলতেন, এই stomachটি না সারলে আমার রোগ সারবে না। এই stomachটিকে ওঁরা বলেন house of life. অর্থাৎ আমাদের এই যে প্রাণ-বায়ু, তার বাস হলো ঐ stomach-এর মধ্যে। আমার ষ্টমাকের ব্যাধি বলে' প্রাণ-বাড়ীখানি ভূমিকম্পের দোলায় অষ্টপ্রহর দুলতো!

আমি কহিলাম—Stomach সারলো বুঝি ঐ 'যম-যম' খেয়ে?

ভদ্রলোক কহিলেন—না, না। অধীর হবেন না। 'যম-যম' ওষুধের নাম আমি কাণেও শুনিনি তখনো! কাগজপত্রে যত ওষুধের বিজ্ঞাপন ছেপে বেরুতো, তার কোনোটির নাম, মায় বিজ্ঞাপনে-ছাপা গুণাগুণ পর্য্যন্ত আমার অজানা ছিল না। সে ওষুধের প্রশংসাপত্র দিয়েছে কোথাকার কোন্ রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদ্‌শা থেকে সুরু করে নাজীর-সেরেস্তাদার, প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েৎ, লেথক-জমাদার সে-সব প্রসংশা-পত্র লাইনে-লাইনে আমার মুখস্থ ছিল! সত্য কথা বলতে কি, ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি-সম্বন্ধে আমার যা-কিছু জ্ঞান, তা এই সব ওষুধের প্রশংসাপত্র থেকে।

কিন্তু সে কথা যাক।

সেবার আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো। বয়স ছাব্বিশ বৎসর। কবিরাজী-এ্যালোপ্যাথি—দু'রকম চিকিৎসা সমানে চলছিল। বোধ হয়, দুটো স্কুলের প্রচণ্ড-বিরোধের ফলে আমি সেরে বেঁচে উঠলুম। নাহলে যে-রকম শরীর—বাঁচবার কথা ছিল না! সে বছর জোয়ান-জোয়ান কত লোক যে মারা গেল…1919-এর সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা-এপিডেমিকের কথা বলছি। ওঃ! সে-কথা মনে হলে এখনো বুক কাঁপে!

সেরে উঠতেই মা আমার ফটোগ্রাফ তোলালেন। মার মনে ভয় হয়েছিল, ছেলের উপর যমের যে-রকম দৃষ্টি চলেছে, কি জানি, কোন্ দিন বা…

অর্থাৎ ফটো থাকলে মারা যাবার পর সে-ফটোর ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট করিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙালে ছেলের স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে মায়ের মনে তবু কিছু সান্ত্বনা মিলবে!

ছবি তোলা হলে মা আমাকে নিয়ে চললেন রাঁচিতে—হাওয়া বদলাতে।

বহুকাল পূর্ব্বে আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। মা ছিলেন অভিভাবক। সে-কথা এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, না হলে বাবার কথা না বলে' শুধু মার কথা বলবো কেন?

তিন মাস রাঁচিতে রইলুম। হঠাৎ একদিন এক পালোয়ানের সঙ্গে দেখা। আলাপ হলো। তাঁর সাকরেদীর ফলে

রীতিমত ডন্ কষা চললো, এবং হেঁটে বেড়ানো! উঃ, সকালে উঠে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলেছি তো চলেছি! মনে হতো, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়ে এ-যাওয়ার শেষ হবে!

তিন-মাসে চেহারা যা হলো, আমাকে কেউ চিনতে পারে না!

রাঁচি থেকে ফেরবার দিন সেখানকার ফটোগ্রাফার মোহনলালকে দিয়ে আর-একখানি ফটো তোলানো হলো।

ফের বাঙলা দেশে ফিরে এলুম···মানে, আমাদের কলকাতার বাড়ীতে।

আমাকে দেখে সকলের তাক লেগে গেল। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁরা দার্জ্জিলিং, মধুপুরে হাওয়া খেতে যাবেন বলে গাঁটরি বাঁধছিলেন, চট্ করে' প্রোগ্রাম বদল করে তাঁরা দার্জ্জিলিং-মধুপুরের মায়া কাটিয়ে রাঁচি চললেন।

রাঁচি থেকে ফেরবার দশ-বার দিন পরের কথা বলছি।

কি-একখানা খপরের কাগজ দেখছিলুম। হঠাৎ নজর পড়লো এই 'যম-যম' ওষুধের বিজ্ঞাপনে। বহু বিজ্ঞাপনের ভিড়ে যম-যমের ছোট্ট বিজ্ঞাপনটুকু কোনো-মতে মাথা তোলবার চেষ্টা করছে···দারুণ লজ্জা, দ্বিধা-সংশয়ের ভারে কি নির্জ্জীব অবসন্ন তার মূর্ত্তি!

আমার মাথায় জাগলো এক আইডিয়া! একটু কৌতুক করি যদি, কি দোষ?

আমার সেই দুখানি ফটোগ্রাফ,—রাঁচি যাবার আগে তোলা, আর পরে তোলা—সেই ফটো দুখানা অবলম্বন করে কৌতুক-সৃষ্টির বাসনা মনে অদম্য হয়ে উঠলো।

একখানি চিঠি লিখলুম যম-যমের একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় সাহার নামে। লিখলুম—

মহাশয়

ছাব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগে ভুগিয়া সর্ব্ববিধ পেটেণ্ট ঔষধ সেবনেও কোন ফল পাই নাই। প্রতিদিন পলে-পলে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। জীবনের কোনো আশা ছিল না।

এমন সুন্দর পৃথিবী—দুদিন সেখানে সুস্থ শরীরে বাস করিতে পাইলাম না—এ কথা ভাবিয়া মন যেন ভারী পাথর হইতেছিল! আত্মীয়-স্বজন আমার জীবন-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া আমার স্মৃতি-রক্ষার বাসনায় অস্থিচর্ম্মসার আমার একখানি ফটো তোলান। আমি বসিয়া বসিয়া মরণের দিন গণিতেছিলাম।

এমন সময় দৈব-গতিকে বিজ্ঞাপনে আপনার অমোঘ ঔষধ 'যম-যমে'র নাম ও গুণাগুণের পরিচয় দেখিয়া শেষ-চেষ্টা-স্বরূপ দোকান হইতে একশিশি যম-যম নগদ সাড়ে বারো আনা মূল্যে কিনিয়া আনিয়া সেবন করিব। একশিশি সেবনে প্রভূত উপকার পাই। তখন আশান্বিত চিত্তে শিশির পর শিশি আনিয়া যম-যম সেবন করিতে থাকি।

এগারো শিশি যম-যম-সেবনে যমের বপু শুকাইয়া আমার বপু মেদে-মাংসে বিপুল সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সে-বপুর ফটো তুলাইলাম।

সেবনের পূর্ব্বে কি ছিলাম এবং সেবনের পরে কি হইয়াছি—দু'সময়ে তোলা দু'খানি ফটোগ্রাফ যে দেখিবে, সেই বুঝিবে যম-যমের কি জমাট-গুণ!

আমাকে দেখিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পত্রান্তরে জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে সেই ফটো-দুখানি লইয়া আপনার সহিত দেখা করিতে পারি।

দেখা করিবার উদ্দেশ্য—সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন এমন ঔষধের গুণ সারা পৃথিবী না জানুক, অন্ততঃ সমস্ত বাঙালীর জানা উচিত। নানা স্থলে বহু প্রবন্ধে আখ্যাত এই Dying Race অর্থাৎ মরণোন্মুখ বাঙালী জাতি 'যম-যম' সেবন করিয়া নবজীবনে জাগ্রত জীবন্ত হইয়া দেশের ও সমাজের দুর্দ্দশা ঘুচাইয়া দেশকে কৃতার্থ করুন! বাঙালীর বক্তৃতা-শক্তি বাঁচিবে, বাড়িবে; এবং সে-শক্তি বাড়িলে দেশের অভাব-দারিদ্র্য যে ঘুচিয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতি

চিঠির ভাষা এমনি ছিল। অত্যুক্তি নয়।

চিঠি লিখে সে-চিঠি দিলুম মোড়ের মাথায় যে লেটার-বক্স ছিল, সেই লেটার-বক্সের মধ্যে ফেলে। ধনঞ্জয় সাহার অফিস কলুটোলা-ষ্ট্রীটে।

চিঠির জবাব এলো। ধনঞ্জয় সাহা লিখলেন, দেখা করবার জন্য। যাবার সময় ফটো দুটো যেন অবশ্য-অবশ্য সঙ্গে নিয়ে যাই, ভুল না হয়! এ-লেখাটুকুর নীচে লাল-কালির রেখা টেনে আণ্ডার-লাইন করতে ভদ্রলোক ভোলেন নি!

গেলুম চলে কলুটোলা ষ্ট্রীটে 'যম-যম' কার্য্যালয়ে। আবু

সলিমানের "গণ্ডার-মার্কা" চটি-জুতোর দোকানের উপর-তলায় যম-যম কার্য্যালয়। সে-চটির দোকান উঠে গেছে ; সে-দোকানে মেওয়া খান্ কাবুলী এখন আঙুর-আপেলের পিরামিড্ সাজিয়েছে—ভারী মোলায়েম তাজা ফল!

সিড়িঙ্গে-সিঁড়ি বয়ে দোতলায় উঠলুম। মেঝে-খোদ্লানো দালানের কোণে একখানি ঘর। কপাটের মাথায় কার্ডবোর্ডে লেখা 'যম-যম'। দোরের সামনে টুলে বসে আছে একটি ছোকরা।

তাকে প্রশ্ন করলুম—ধনঞ্জয় বাবু আছেন ?

অম্লান অকুণ্ঠিত স্বরে সে বললে,—আজ্ঞে, না। তিনি বেরিয়ে গেছেন।

বললুম,—কখন ফিরবেন ?

বললে—ফিরতে অনেক রাত্তির হবে, বলে গেছেন।

বিরক্তি ধরলো মনে। বললুম,—তা হলে একটু কাগজ আর একটা পেন্সিল দাও। লিখে রেখে যাই যে আমি এসেছিলুম। আমাকে তিনি এই সময়ে আসতে বলেছিলেন ; তাই আমার আসা।

এ-কথায় ছোকরার ভাব গেল বদলে। সে বললে,—আপনাকে আসতে বলেছিলেন! ও! তা হলে আপনি আসুন। তিনি আপিসে আছেন।

আমি অবাক! যাই হোক, ঘরে প্রবেশাধিকার পেলুম। ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো।

বেঁটে কালো লোক। জীর্ণ মলিন বেশ—গলায় দু'হালি তুলসী-কাঠের মালা—মাথায় তেল জবজব করছে। একখানা জারুল-কাঠের তক্তাপোষে বসে আছে—সামনে দোয়াত-কলম, গঁদের শিশি, একখানা গুপ্তপ্রেস পাঁজি আর একগাদা ক্যাটালগ।

পরিচয় হলো। কথাবার্ত্তা হলো। ফটো দুখানি দেখালুম। দেখে মহা-খুশী। লোকটির চেহারা দেখে মনে হয়, বোকা আসলে কিন্তু বেশ সেয়ানা!

জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দোকান থেকে 'যম-যম' কিনেছিলুম?

বললুম,—আমি শয্যাগত ছিলুম। নিজের হাতে কিনিনি তো। চাকরে কিনে এনেছিল।

নানা কথার পর প্রস্তাব করলেন, ফটো দু'খানি যদি তাঁকে দিই, তা হলে সে-ফটো থেকে ব্লক তৈরী করিয়ে সে-ব্লক তিনি তাঁর বিজ্ঞাপনে ছেপে দেবেন। তাতে প্রচারের সুবিধা এবং বাঙালী-জাতের বাঁচবার আশা হবে। ফটো দু'খানি আমাকে তিনি আবার ফেরত দেবেন, বললেন।

সুবিধা যে হবে, বিশেষ, বিজ্ঞাপনে-ভোলা এই ব্যাধি-জর্জ্জর বাঙলা দেশে—তা আমি বুঝেছিলুম।

আমি বললুম—আমাকে কি মূল্য দেবেন?

কথা শুনে ধনঞ্জয় সাহা আঁৎকে উঠলেন! দুচোখে যে-ভাব প্রকাশ পেলো, মনে হলো, তিনি আর ইহলোকে নেই!

ধনঞ্জয় সাহা বললেন, ব্লক করাতে খরচ আছে। একখানা-দুখানা নয়, অমন বিশ-পঁচিশ সেট ব্লক করাতে হবে। তার উপর এক-লাখ ছবি ছাপতে অনেক খরচ। কাগজের দাম, ছাপাই-খরচ, দপ্তরী, ডাকমাশুল ইত্যাদি ইত্যাদি!

আমি বললুম—আমার যদি লাভ না হলো তো ফটো দেবার দরকার?

ধনঞ্জয় সাহা বললেন,—আপনার ছবি ছাপা হবে আমাদের এক-লাখ ক্যাটালগে ··তা ছাড়া যত দৈনিক আর মাসিক-কাগজে। তাতে আপনার সামান্য লাভ হবে, ভাববেন না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আপনার নাম রটে যাবে।

হেসে আমি বললুম,—যদি ভূতের গল্প লিখি—সে-লেখা মাসিকে ছাপা হলে নাম আরো বড় হয়ে বেরুবে, তা জানেন? সে-নাম ঘুড়ির কাগজে ছেপে বেরুবে না, বেরুবে মোটা-মাসিকের আইভরি-ফিনিশ কাগজের পাতায়। সে-নাম অমর হয়ে থাকবে। মাসিক-পত্র বাঁধাবার সময় লোকে বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো ছিঁড়ে বাঁধায়—বিজ্ঞাপনের সে-সব ছেঁড়া পাতা দপ্তরীপাড়ার ডাষ্টবিনে চড়ে ধাপার মাঠে চলে যায়। মাসিকের গল্পে নাম ছাপা হলে সে নাম আর ক্ষয় হবার নয়!

ধনঞ্জয় সাহা বললেন—যে-গল্প লিখবেন, মাসিকে তা ছাপা হবে, সে সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি নেই তো। কত লেখা অমন ফেরৎ যায়।

আমি বললুম,—একালে যাকে বলে এ্যাডভেঞ্চার অর্থাৎ গাঁজালো গল্প, তার আর মার নেই! জানেন, এই কলকাতা সহরে সাত হাজার ন'শো বত্রিশখানা মাসিক কাগজ ছাপা হয়; তাছাড়া এক পয়সা দু পয়সা দামের সাপ্তাহিক ছাপা হয় সতেরো হাজারের উপর। এত লেখক কোথায় তারা পাবে? যে কোনো কাগজ খুলে দেখুন, লেখা যে লেখে, সেই লেখক; এবং তারা যা লেখে, সেই লেখাই আজকাল কাগজে ছাপা হয়। সুতরাং ছাপা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনো হেতু নেই।

বহু তর্ক উত্থাপন করেও ধনঞ্জয় দেখলে, আমার মন লোভে পরিপূর্ণ! তখন নিরুপায় হয়ে সে বললে,—বেশ, এত বলছেন, নিন তবে এই পাঁচটি টাকা···

—অসম্ভব! বলে আমি উঠে পড়লুম এবং ফটো দু'খানি নিয়ে চলে এলুম।

পরের দিন ধনঞ্জয় সাহা সশরীরে আমার গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। বহু বিবেচনা করতে বলা সত্বেও যখন দেখলেন, আমি অটল, তখন পকেট থেকে একখানি দশ-টাকার নোট বার করে আমার সামনে ধরলেন, বললেন—নিন, আর আপত্তি করবেন না। ফটো দু'খানি এনে দিন।

আমি বললুম,—ক্ষেপেছেন মশায়!

তারপর ক্রমে দশ, পনেরো, পঁচিশ, পঞ্চাশ, সত্তর, পঁচাশী; একশো এবং একশো এসে উঠলো নগদ সাড়ে-চারশোয়! ধনঞ্জয়

সাহা আমার পা-দুখানি জড়িয়ে ধরে বললেন,—নিন মশায়, সাড়ে চারশো টাকা নিয়ে ছবি দিন, আর না হয় আমার গলায় পা চাপিয়ে দিন! আমি ছাপোঁষা মানুষ।

এই সাড়ে-চারশোয় উঠতে ধনঞ্জয় সাহার সময় লেগেছিল প্রায় দেড় মাস। রোজ এসে সে দর কষ্‌তো!

রাজী হলুম। বেশী টানাটানি করাটা ব্যবসার ক্ষেত্রে সুবুদ্ধির লক্ষণ নয়! ফটো দুখানি তাঁর হাতে দিলুম। ব্লক তৈরী করিয়ে সে দুখানি ফটো তিনি ফেরত দিয়েছিলেন।

সে বছর পূজার মরশুমে আমার সেই ছবির মূর্ত্তি-দুটি কাগজে-কাগজে ছাপা হয়ে এক-লক্ষ ক্যাটালগের পিঠে চড়ে এই ব্যাধি-জর্জ্জর বাঙলা-মুল্লুকে আমাকে প্রখ্যাত করে তুল্‌লো।

বড়দিনের সময় ধনঞ্জয় সাহা দেখা করতে এলেন। বললেন,—সত্যি, আপনি ক' শিশি 'যম-যম' খেয়ে এমন চেহারা বানিয়েছেন, বলবেন?

আমি বললুম—কেন?

সাহা বললেন,—বিজ্ঞাপনের ফলে ওষুধের বিক্রী মফঃস্বলে কিছু বেড়েছে, কিন্তু নালিশ-লেখা চিঠি আসছে অসংখ্য! তারা বলছে; চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ শিশি খেয়েও চামড়ায় তাদের হাড় ঢাকা পড়েনি! তাই, মানে···

আমি বললুম,—বিশ্বাস করবেন? একটি শিশি কি, এক

কিন্তু 'যম-যম' আমি মুখে দিইনি—কস্মিন কালে নয়! সত্য-কথা বলতে কি, 'যম-যমের' বিজ্ঞাপনই যা-দেখেছি, শিশিও কখনো চক্ষে দেখিনি! আজ পর্য্যন্ত নয়।

আমার পানে চেয়ে সাহা যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো! বহুক্ষণ পরে বললে,—একটা পরামর্শ আছে।

—বলুন।

—আমি যম-যম বিক্রী করছি। আমিও কখনো এক কৌটা যম-যম মুখে দিইনি। তার মানে, ওষুধটা আমার তৈরী নয়। আমার এক বন্ধু এটি তৈরী করেছিল। পয়সার অভাবে শিশি জোগাড় করতে পারেনি বলে আমায় রেজেষ্ট্রি-কোবালা করে ওষুধটা সে বেচে দেয়। আপনার চিঠি পড়ে আমার তাক লেগে ছিল। যম-যমে নাকি আবার এমন চেহারা হয়! ওতে যে-সব পদার্থ আছে,—আমি জানি। বেল-পাতার রস, তুলসী-পাতার রস, শিউলি-পাতার রস; তার সঙ্গে লেবুর রস, চিনি আর গোলাপ-ফুলের পাপড়ি। এগুলো মিশিয়ে জাল দেওয়া হয়। সে মিক্শ্চারের এমন গুণ! আপনার কথায় আমার মতো হুঁশিয়ার লোকের তাক লেগেছিল সত্যি! এখন আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা হয়েছে অসাধারণ। আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধি আর বাক্যকে যদি সহায় পাই, তা হলে এই যম-যমের গুণে আমাদের ব্যবসা যে জমজমিয়ে উঠবে, তাতে ভুল নেই। কমিশন-সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা আপনি করবেন, তাতেই আমি রাজী। তার পূর্ব্বে খরচটা শুধু একবার দয়া করে খতিয়ে দেখবেন।

সাহা মহাশয় খরচের খতিয়ান দেখালেন। দাম যা কিছু, তা ঐ চিনির। লেবু বা পাতা-লতা বাইরে থেকে এখনো বিনামূল্যে সংগ্রহ করা চলে। তার উপর ঐ শিশির দাম, কাগজ আর ছাপার খরচ। অর্থাৎ শিশি-পিছু গড়ে খরচ পড়ে তিন পয়সা। সুতরাং...

ভাবলুম, মন্দ কি! লক্ষ্মী যখন ধনঞ্জয়-বেশে সাদরে আমাকে আহ্বান করছেন...এ তো বিজ্ঞাপনের যুগ! বচনের যুগ! আসল গুণ এ যুগে গুণ-চাপা পড়েছে! বচনই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ! দি গ্রেট আর্ট, বচন! এই বচনের জোরে বিয়ের বাজারে ভুস্যুণ্ডি-বরের আদর, চাকরির বাজারে লম্বসাট আকাটের জয়-জয়কার, লিটারারি বাজারও বিজ্ঞাপনের জোরে সরগরম!

রাজী হলুম। সেই অবধি আমিই এই যম-যমের একমাত্র এজেন্ট। কলকাতায় বিক্রী করা কঠিন। সেখানে সবাই নিজেকে অতি-চতুর ভাবে! তার উপর নিজের স্ত্রী-পুত্রকে বিশ্বাস করে না, তা বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করবে কি! কলকাতার বাইরে মানুষের মনের এমন দুর্গতি এখনো হয়নি! কাজেই আমাদের অনুশোচনার কারণ এ-যাবৎ ঘটেনি!

. . .

কথা শেষ করিয়া ভদ্রলোক আমার পানে চাহিলেন; তার পর সিগারেটের টিনটি হাতে লইলেন।

ট্রেণ থামিয়া গেল। ওদিকে নিদ্রালু স্বরে কুলি হাঁকিল,—বর্দ্ধমান।

ভদ্রলোকের যেন চমক ভাঙিল! কহিলেন,—বর্দ্ধমান! আমার বর্দ্ধমানের সাব-এজেণ্টকে লিখেছিলুম, বায়না দিয়ে সের-পাঁচেক মিহিদানা-সীতেভোগ তৈরী করিয়ে ষ্টেশনে নিয়ে আসবে। ষ্টেশনের গুলো তেমন জুৎসই নয়। দেখি, সে নিয়ে এলো কি না।

টক্ করিয়া ভদ্রলোক প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িলেন। তাঁর ভঙ্গী দেখিয়া আমার মনের কোণে কে যেন বার-বার বলিতেছিল,—আইনের অনিশ্চিত পথে গিয়া ও-ভিড়ে প্রবেশ করিয়ো না। তার চেয়ে এই বিজ্ঞাপনের আর্ট দুরস্ত করিয়া এমনি কোন পেটেণ্টের পুচ্ছ ধরিয়া যদি...

ছুটির পর কলেজ খুলিয়াছে। ল লেকচার এ্যাটেণ্ড করিতেছি।

কোর্টে সারা দিন কোনো মতে সময় কাটাইয়া প্রোফেসর মহাশয় ক্লাসে যখন টেনান্সি-এ্যাক্ট খুলিয়া alluvion আর deluvion বুঝাইতে বসেন, আমার মন তখন রেলওয়ে-লাইনের দুধারে মাঠে ছুটিতে থাকে! মনে হয়, এ-বাঁধন কাটিয়া ছুটিয়া যাই তুলসী-পাতা আর বেল-পাতার সন্ধানে! যম-যম গোছ একটা পেটেণ্ট ঔষধ খুলিয়া...

অর্থাৎ ব্যবসার আর্টে হাত পাকাইতে পারিলে বাঙলা দেশে পয়সা-উপার্জ্জনের সুযোগ ভারী সহজ! বিজ্ঞাপনের চটকে বাঙালী যেমনি ভোলে, এমন ভোলা আর-কোনো জাত ভোলে না!

ধন্বন্তরি

হাতটায় কি যে হইল—ডান হাত! কেমন যেন...অর্থাৎ ব্যথা ঠিক নয়; কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য! এমন তো কখনো হয় নাই! আজ বিশ-বাইশ বৎসর এই হাতে কলম পিষিতেছি; তার পূর্ব্বে এই হাত লইয়াই স্কুলে অঙ্ক কষা—ছুটীর দিনে পরের বাগানে ঢুকিয়া···

গেলাম ডাক্তারের কাছে। পাড়ার ছেলে। সদ্য পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। রোগ হইলে ভয়ে এখনো তার কাছে কেহ ঘেঁষে না! এখনো শত-মারী হওয়া দূরের কথা, এক-মারীও হইতে পারে নাই!

ছোকরা ডাক্তার বলিল—জিভ দেখি।

দেখাইলাম। তারপর ছোকরা আমায় ওঠ্-বোস্ করাইয়া হাতখানা ধরিয়া উঠাইল, নামাইল, বাঁকাইল। যেন বেউড় বাঁশ পাইয়াছে! শেষে বলিল,—রক্ত এগ্‌জামিন করিতে হইবে।

তার মানে, পয়সা! সরিয়া পড়িলাম।

তারপর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। গলির মোড়ে ডিস্পেন্সারি। ভদ্রলোক যেন আমারি ধ্যান করিতেছিলেন! পাইবামাত্র লুফিয়া লইলেন। বলিলেন,—কি খপর?

বলিলাম,—হাত···এই ডান হাত!

তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—যেন চীনা পটকার বাঁধা বাণ্ডিলে কালীপূজার রাত্রে অগ্নি-সংযোগ!

কয়েকটি প্রশ্ন মনে আছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ পর্য্যন্ত কত পাণ খাইয়াছি? রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরি ক'বার? ঘুমাইলে আমার নাক ডাকে কি না? একমাসের মধ্যে ক'মাইল হাঁটিয়াছি? পাড়ায় ক'ঘর ব্রাহ্মণের বাস? ট্রামে একমাসের মধ্যে কেমন সব লোকের পাশে বসিয়াছি? তিন বছরের মধ্যে কত মাইল হাঁটিয়াছি? বছরে কতবার হাই তুলি? ইত্যাদি ইত্যাদি!

কোনোটার জবাব দিলাম,—কোনোটার উত্তরে বলিলাম, জানি না। মনে নাই।

তিনি ঔষধ দিলেন; বলিয়া দিলেন, ঔষধ খাইতে খাইতে এক-দিন সারিতে পারে। না সারে, তুঃখ কি? জীবনের মেয়াদ তো প্রায় চুকাইয়া আনিয়াছি!

পথে আসিতে দেখা হইল বটকৃষ্ণর সঙ্গে। কহিল—কি হে, খপর কি?

মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম—হাত! ডান হাত!

বটকৃষ্ণ বলিল—কি হইয়াছে?

কহিলাম—তা ঠিক বুঝিতেছি না। তবে হাতখানা ঠিক আগেকার মতো নাই!

বটকৃষ্ণ কহিল—আমারো অমন হইয়াছিল। হাত···ডান হাত···আচ্ছা, হাত চুলকায় ?

চিন্তা করিয়া কহিলাম,—না !

বটকৃষ্ণ বলিল—ঠিক। আমারো চুলকাইত না। আচ্ছা, ভারী জিনিষ তুলিতে পারো ?

কহিলাম—তুলিয়া দেখি নাই।

বটকৃষ্ণ মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, কহিল,—ঠিক ! আমি কখনো ভারী জিনিষ তুলিবার চেষ্টা করি নাই ! আচ্ছা, হাত মুড়িয়া রাখিলে কষ্ট বোধ করো ? না, হাত ঝুলাইয়া রাখিলে ?

কহিলাম,—দু অবস্থাই সমান।

বটকৃষ্ণ কহিল—আর কিছু বলিতে হইবে না। গত বৎসরের কথা। ঠিক বর্ষার পরে। কি জানো ? বর্ষায় হাতে স্যাঁতানি ধরে ! ইহা হইতেই বাত ! শীত পড়িলেই···ও খুব দেখা আছে। এর-তার কাছে যাইয়ো না। আমি অনেক ডাক্তার দেখাইয়াছি, কোনো ফল হয় নাই। শেষে···

বটকৃষ্ণ তখনি সামনের মুদির দোকান হইতে কাগজ-পেন্সিল চাহিয়া একটা নাম-ঠিকানা লিখিল ; লিখিয়া কাগজখানা আমার হাতে দিয়া বলিল,—বংশীবদন কবিরাজ। এ রোগে ইনিই একমাত্র ধন্বন্তরি ! এখনই যাও।···কাজ ?···না। আগে হাত ? না, আগে কাজ ? হাত থাকিলে তবে তো কাজ করিবে !

ভাবিলাম, কথাটা সত্য। চোখের সামনে সারা পৃথিবী কুণ্ডলী পাকাইয়া দারুময় জগন্নাথ-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেছিল !

শ্রীপতির সঙ্গে দেখা। দু'চারিটা কথার পর বলিলাম—হাতের কথা! বটকৃষ্ণর সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত বংশীবদন কবিরাজের কথা বলিলাম।

শুনিয়া শ্রীপতি চমকিয়া উঠিল; একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—রামচন্দ্র! হাত! পুরুষ-মানুষের হাত—তাও ডান হাত! আনাড়ির কাছে সেই হাত সঁপিয়া দিবে—তার চেয়ে কালীঘাটে গিয়া হাড়-কাঠের মধ্যে হাতখানা গুঁজিয়া দাও না! খবর্দ্দার! শোনো আমার কথা। আমার ভাই...ছোট ভাই শচীপতি—তারো ঠিক এমনি হইয়াছিল। চোখে ছাখো, হাতে কোন গোলযোগ নাই—কিন্তু ঐ যে বলিলে, যেন কেমন-কেমন···স্পষ্ট বুঝা যায় না! ইহাই রোগ! চেতলায় আছেন শঙ্কর ডাক্তার—পাশ-করা নন; কিন্তু অনেক পাশ-করা ডাক্তারের গলা কাটিয়া দিতে পারেন, এমন শক্তি! তাঁর ঔষধে শচীপতি সারিয়া উঠিল। হাতে এখন ক্যায়সা জোর। বোধ হয়, একটি ঘুষিতে ডাব ভাঙ্গিতে পারে।

উৎফুল্ল স্বরে কহিলাম,—ডাব ভাঙ্গিয়াছে?

শ্রীপতি বলিল—ভাঙ্গে নাই। তবে পারে, বোধ হয়!

শঙ্কর ডাক্তারের ঠিকানা টুকিয়া লইলাম বংশীবদনের নাম-লেখা কাগজে—সে নামের পাশে। শ্রীপতি চলিয়া গেল।

রবিবারের দিন। ভূধরের সঙ্গে দেখা। ভূধর বলিল,—মাংস কিনিতে চলিয়াছি।

বলিলাম,—আছো কেমন?

বলিলাম,—ডান হাত যাইতে বসিয়াছে।

ভূধর বলিল,—তার অর্থ?

অর্থ খুলিয়া বলিলাম। ভূধর বলিল,—কোনো ঔষধের কাজ নয়! কামারডাঙ্গায় আছে এক বুড়ী। বুড়ীর বয়স নব্বই বছর। শনিবার রাত্রে বুড়ী দেয় জল-পড়া...অব্যর্থ! কামার-ডাঙ্গায় যাও...সামনের শনিবারে রাত ঠিক দশটার সময়।

ভূধর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দু'পা অগ্রসর হইয়াছি, হাতে এক-ভাঁড় দই রতিনাথের সঙ্গে দেখা।

কথায় কথায় হাতের কথা উঠিল। শুনিয়া রতিনাথ কহিল,—আমার পিশিমা···তাঁর হইয়াছিল ঐ রোগ...কিছুতে সারে না! শেষে জানো, বীডন-স্কোয়ারে আছেন চৈতনচাঁদ···অবধূত? ফুঁয়ের জোরে সে-হাত সারাইয়া দিল। পিশিমা থাকেন পশ্চিমে—বড় জাঁতা ঘুরাইয়া প্রত্যহ আড়াই-সের গম ভাঙ্গিয়া আটা বাহির করেন। জাঁতা-ভাঙ্গা আটা—সেবারে বড়দিনের সময় পিশির কাছে গিয়াছিলাম, সে-আটার রুটী খাইয়া আসিয়াছি! রুটী তো নয়—ভিটামিনের বস্তা!

এ-নামটিও সেই বংশীবদনের কাগজের কোণে টুকিয়া লইলাম।

রতিনাথ চলিয়া গেল। দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, করি কি? কোথায় কার কাছে যাই? রবিবার নহিলে চিকিৎসারও অবসর মেলে না···

এমন সময় সামনে আসিয়া উদয় হইল কামাখ্যা।

কুশল-প্রশ্ন বলিবামাত্র হাতের কথা উঠিল। শুনিয়া [illegible] ল—এ-রোগ এবারের বর্ষায় দেখা দিয়াছে। আমার খুড়োমশায়···এগারো বৎসর হু'পায়ে বাত লইয়া এমন কাতর হন নাই, যেমন হইয়াছেন এ-বারে তাঁর ডান হাত লইয়া! কত চিকিৎসা করানো হইল—রোগ সারে না! শেষে টালায় আছেন অবিরাম-মোক্তার···তাঁর মাসিমার এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ··· ধন্বন্তরি! কাহারো কথা তুমি শুনিয়ো না ভাই, সোজা টালায় চলিয়া যাও! অবিরাম-মোক্তার। পুলের ওপারে গিয়া যার কাছে নাম বলিবে, সে-ই তোমাকে বাড়ী দেখাইয়া দিবে!···আমি চলিলাম—বাজারে পায়রা কিনিব।

হাতে সেই অস্বাচ্ছন্দ্য! ট্রামের পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চিন্তার সীমা নাই! সকলেই বলে, ধন্বন্তরি! সেকালে ধন্বন্তরি ছিলেন একজন! কিন্তু আজ এই একটু অবসরে এক নয়, বহু ধন্বন্তরির পরিচয় মিলিল! এতগুলির মধ্যে কোন্ ধন্বন্তরির শরণ গ্রহণ করি?

ভাবিলাম, গৃহে ফিরিয়া একবার ভাবিয়া-চিন্তিয়া···বৈকালেই না হয় যাওয়া যাইবে! এতদিন রোগ ভোগ করিতেছি—না হয় আর একবেলা...

· ·

গৃহে ফিরিলাম। ফিরিয়া দেখি, এক অতিথি· মামাতো· ভাই হরেন।

হরেন বলিল,—চলো, মাছ ধরিতে যাই। ঢাকুরিয়ায় ভালো পুকুর পাইয়াছি।

মাছ-ধরার সখ চিরদিন। আজ-কাল পুকুর আর কেহ ছাড়িয়া দিতে চায় না! অব্যবসায়ী বাঙালীর মাথায় ব্যবসা-বুদ্ধি গজাইয়া উঠিয়াছে!

কোনো মতে মাথায় জল ঢালিয়া মুখে অন্ন গুঁজিয়া হরেনের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে ফিরিলাম।

ধন্বন্তরির কাছে আর যাওয়া হইল না। না যাই, সারাদিন ছিপ হাঁকড়াইয়া হাতটা যেন…

বাঃ…সে কেমন-কেমন ভাব আর নাই তো!

আপনারা বলিতেছেন—মাছ?

না, মাছ পুকুরে আছে,…মনে হইল। মাছ ধরিতে যায় অনেকে—কিন্তু ক'জন মাছ ধরিয়াছে, বলিতে পারেন? মাছ না ধরি, ছিপ চালাইয়া আমার ডান-হাত সারিয়া গিয়াছে।

শেষ